লাগিলেন।—"এই মোটে বাত্রিশ বছর তোমার বয়স, সারাটা জীবন প'ড়ে রয়েছে, কি ক'রে তোমার কাটবে? তোমার দিদিই বা নিজের সংসার ছেড়ে কত দিন তোমার কাছে থাকতে পারবেন? বিমাতা হলেই যে একটি আস্ত রাক্ষসী হবে, এমনই বা কি কথা? সে রকম হয় কারা? যারা ছোট-লোকের ঘরের মেয়ে। ভদ্রবংশের একটি ডাগর দেখে মেয়ে বিয়ে ক'রে আন, সে তোমার মেয়েকে নিজ সন্তানের মতই লালন-পালন করবে—তোমার সংসার বজায় রাখবে।"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাত আট মাস থাকিয়া, দিদিও ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন কি করি, অগত্যা বিবাহই করিয়া ফেলিলাম। দিদি নববধূকে সংসার বুঝাইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ যাঁহাকে ঘরে আনিলাম, তিনি মাতৃবৎ স্নেহাদরেই আমার খুকীকে বুকে তুলিয়া লইলেন। এ পক্ষেও আমার দুইটি কন্যা ও তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্র তিনটি আপনাদের আশীর্বাদে জীবিতই আছে, কিন্তু [illegible] তাহাদের শৈশবেই যমের মুখে তুলিয়া দিয়াছি।

২

এক মাস কাটিয়া গেল, জামাতার কোনও সংবাদ নাই। গত পূর্ণিমা-রাত্রিতে বাবা সত্যনারায়ণের সিন্নী দিয়াছি। গৃহিণী স্থানীয় কালী-মন্দিরে মানত করিয়াছেন, জামাতা ফিরিলেই জোড়া পাঁঠা দিয়া মা'র পূজা করিবেন। পাড়ার বর্ষীয়সী আনন্দ-ঠাকুরাণী

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া গৃহিণী ও খুকীকে "নীলকুল বাসুদেবের কথা" শুনাইয়া যাইতেছেন—আমিও শুনিতেছি।' ইহার ফলশ্রুতি এই প্রকার—"ধন না থাকলে তার ধন হয়, পুত না থাকলে তার পুত হয়, বন্দী থাকলে ছাড়ান পায়, দূরের সুসমাচার নিকটে আসে।"—জ্ঞানদা-ঠাকুরাণী বলিয়াছেন, ইহা একেবারে অব্যর্থ,—এই কথা শুনাইয়া, অনেক গৃহস্থকে তিনি চিঠি আনাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত করিয়াছেন,—তবে ভক্তি থাকা চাই।

কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তুমি নিজে একবার কলকাতায় গিয়ে সন্ধান কর। বাসার ছেলেরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় গেছে, বেয়াইয়ের মামার কাছে সে কথা তারা গোপন করেছে! তাঁদের বাপু-বাছা ব'লে খোসামোদ ক'রে কথা বের ক'রে নাও গে। মেয়েটার মুখপানে ত আর তাকানো যায় না!"

অদ্য আহারাদির পর কলিকাতা যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। গোরুর গাড়ীও বলিয়া রাখিয়াছি।

বেলা তখন এগারটা। স্নানের পূর্ব্বে বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, হঠাৎ নজর পড়িল, বাঁড়ুয্যেদের পাড়ো ভাঙ্গা বাড়ীর উঠান দিয়া, লাল পাগড়ী মাথায় ব্যাগ কাঁধে পিয়ন আসিতেছে। একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলাম—দেখি এই দিকেই আসে কি না। বুকটা দুরু দুরু করিতে লাগিল।

এই যে, এই দিকেই যে আসে!

পিয়ন আসিয়া প্রণাম করিল। তার পর হস্তস্থিত একগোছা চিঠির মধ্য হইতে বাছিয়া একখানি আমার হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। খামের চিঠি।

আমি তাড়াতাড়ি ভিতর হইতে চশমা আনিয়া চোখে দিয়া ঠিকানা পড়িলাম। জয় বাবা সত্যনারায়ণ! জয় বাবা নীলকুল বাসুদেব! খুকীর নামে চিঠি, জামাতার হস্তাক্ষর! কোথা হইতে লিখিল, জানিবার জন্য টিকিটের উপরকার ছাপটা পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু তেল-কালী, এমন ধ্যাবড়াইয়া গিয়াছে যে, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, বাবাজী যে প্রাণগতিক ভাল আছেন, ইহাই আপাততঃ পরম লাভ মনে করিয়া, দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে ডাকিলাম। তিনি আসিলে হাসিমুখে বলিলাম, "বাবা সত্যনারায়ণ, বাবা নীলকুল বাসুদেব মুখ তুলে চেয়েছেন। এই নাও তোমার জামাইয়ের চিঠি, খুকীকে দাও গে। আর তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে আমায় বল, জামাই কোথা আছেন, কেমন আছেন, কবে বাড়ী আসবেন। আমি ঘরে গিয়ে বসছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহিণী চিঠি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন,—তাঁহার মুখখানি গম্ভীর, চোখ দু'টি ছলছল করিতেছে, সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেকার সমস্ত আনন্দ উৎসাহ কোথায় উড়িয়া গেল। আমি ভীতভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

গৃহিণী চিঠি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

বলিলাম, "কেন ? জামাই লিখেছেন মেয়েকে চিঠি, আমি পড়বো কেন ?"

"পড়ুন, দোষ নেই। আমিও পড়েছি। মেয়ে ত চিঠি পড়েই আছাড় খেয়ে পড়েছে। আমায় বল্লে, 'মা, চিঠি বাবাকে দেখাও, যা করতে হয়, তিনি করুন।"

কম্পিত হস্তে খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া পড়িলাম। পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, চোখে অন্ধকার দেখিলাম। চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল—

"সাধ্বি !

আমি মাসখানেক নানা গুরুতর কার্য্যে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, তোমায় চিঠি লিখিবার তিলমাত্র অবসর পাই নাই।

আমরা কয়েক জন যুবক মিলিয়া সন্তানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। তুমি আনন্দমঠ পড়িয়াছ কি না, জানি না, যদি পড়িয়া থাক, তবে সন্তান কাহাকে বলে, তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছ। জননী জন্মভূমিকে পরাধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করাই সন্তানের জীবন-ব্রত। কলিকাতা হইতে "যুগান্তর" নামে আমরা একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিতেছি, আমার অনুরোধ, বাবাকে বলিয়া তুমি তাহার গ্রাহক হইয়া নিয়মিতভাবে উহা পাঠ করিবে।

আমি দল গঠন করিয়া আপাততঃ গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিতে বাহির হইয়াছি। কবে কোথায় থাকি, কিছুরই

স্থিরতা নাই। যে স্থান হইতে এই পত্র তোমায় লিখিতেছি, কল্যই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব।

মা'র শৃঙ্খল যত দিন না ভগ্ন করিতে পারি, তত দিন আমাদের গৃহ-সংসার নাই, পিতামাতা নাই, স্ত্রী-পুত্র নাই,—কিছুই নাই। আছে কেবল দেশ। (আনন্দমঠ দেখ) এ জীবনে এ পবিত্র ব্রত যদি উদ্‌যাপন করিতে পারি, তবেই গৃহে ফিরিব, তোমার সঙ্গে আবার আমার মিলন হইবে, আবার আমি সংসারী হইব; নচেৎ এই শেষ। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, আমার বিশ্বাস আছে যে, ধর্ম্মপথে তুমি আমার সহায় হইবে, বিঘ্নরূপিণী হইবে না। বিভুপদে সতত প্রার্থনা করিবে, যেন আমাদের উত্তম সফল হয়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, ব্রত উদ্‌যাপনান্তে এক দিন গৃহে ফিরিতে পারি। ইতি—

দেশমাতার সন্তান

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।"

পুনশ্চ। পত্রখানি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে, কারণ, অদূর-ভবিষ্যতে বাড়ী খানাতল্লাসী হওয়া বিচিত্র নহে।

পত্র পড়িয়া গৃহিণীর হস্তে উহা ফেরত দিয়া, দুই হাতে দুই রগ্‌ টিপিয়া, বালিস বুকে দিয়া, কিছুক্ষণ আমি শয্যায় পড়িয়া রহিলাম। অগ্রহায়ণ মাসের শীতেও দেহ হইতে দর-দর করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। "ও মা, কি বিপদ হ'ল গো! বিপত্তে মধুসূদন। বিপত্তে মধুসূদন!"—বলিতে বলিতে গৃহিণী আমায় পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

মিনিট পাঁচেকে আমি একটু সামলাইয়া উঠিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম, "তুমি মেয়ের কাছে যাও, এখানে কি করছ? তাকে সামলাও গে।"

গৃহিণী চলিয়া গেলে আমি ভাবিতে লাগিলাম, এত দিন মনে মনে আশা ছিল, বেহাই-মহাশয় সাহেবদের প্রিয়পাত্র অনুগত লোক,—ছেলেটা বি-এ পাস করিলে সাহেবদের ধরিয়া তাহাকে তিনি একটা ডেপুটী করিয়া দিতে পারিবেন। অন্ততঃ পক্ষে আইন পাসের পর মুন্সেফী পদ দেওয়াইতে পারিবেন, মেয়ে আমার হাকিমের পরিবার হইবে। সে সব আশা-ভরসা সমস্তই কর্পূর হইয়া গেল!

ক্রমে মনে ক্রোধের সঞ্চারও হইল। তোর কি বাপু সবস্তই অদ্ভুত? স্বদেশী হয়ে একেবারে গৃহত্যাগ! কেন রে বাপু, এত বাড়াবাড়ি কেন? যা রয় সয়, তাই করলেই ত হয়! স্বদেশী হয়েছিস, বেশ ত! মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পর্, দেশী চিনি, করকচ নুণ ব্যাভার কর, বিড়ি খা—কেউ ত মানা করছে না। একেবারে গৃহত্যাগ, পত্নীত্যাগ! তাই যদি তোর মনে ছিল, তবে এক ভদ্রকন্যাকে বিবাহ ক'রে তার সর্ব্বনাশ করলি কেন?

তখন মনে পড়িল যে, বিবাহের সময় এরূপ মনোভাব তাহার ছিল না! স্বদেশীর ঢেউ ত পূর্ব্বাবধিই উঠিয়াছিল। বিবাহে, জোর ভয়ে, বিলাতী জুতা, সিল্কের বিলাতী ছাতা, বিলাতী সাবান, এসেন্স প্রভৃতি প্রসাধন-দ্রব্য কত তাহাকে উপহার দিয়াছি, সে সব ত হাসিমুখেই সে গ্রহণ করিয়াছে ও ব্যবহার

করিয়াছে দেখিয়াছি। তবে এবার কলিকাতায় ফিরিয়া সে এমন উৎকট স্বদেশী হইয়া উঠিল কি করিয়া?

এ অবস্থায় আমি আর কলিকাতায় গিয়া কি করিব? তার চেয়ে বরং রাজসাহী গিয়া বৈবাহিকের সঙ্গে দেখা করিয়া, এ বিপদে কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করি। গৃহিণী ফিরিয়া আসিলে সেই কথাই তাঁহাকে বলিলাম, তিনিও এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

গোরুর গাড়ী পূর্ব্বেই বলা ছিল। স্নানাহার সারিয়া, দুর্গা বলিয়া রাজসাহী যাত্রা করিলাম।

৩

যে দিনের কথা বলিতেছি, তখন ঈশ্বরদি হইতে রাজসাহী যাইবার রেল খুলে নাই। নাটোরে নামিয়া অশ্বযানে বত্রিশ মাইল অতিবাহন করিয়া রাজসাহী যাইতে হইত। রাজসাহীর উকিল বাবুরা একটা কোম্পানী গঠন করিয়া, যাতায়াতের জন্য কতকগুলি অশ্বযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলের আড্ডা ছিল।

নাটোরে নামিয়া, অশ্বযানে আরোহণ করিয়া যখন রাজসাহী গিয়া পৌঁছিলাম, বেলা তখন চারিটা, বৈবাহিক-মহাশয় তখনও কাছারী হইতে ফিরেন নাই। তাঁহার পুত্রেরা অতি সমাদরে আমার অভ্যর্থনা করিল। হাত-মুখ ধুইয়া, ডাব ও সরবৎ পান

করিয়া, বৈঠকখানা-ঘরে আরাম-কেদারায় পড়িয়া আমি বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

সাড়ে পাঁচটায় বৈবাহিক-মহাশয় বাড়ী ফিরিলেন। আমি আসিয়াছি শুনিয়া কাছারীর বেশেই আমার নিকট আসিয়া বসিলেন। অদ্য প্রভাতে প্রাপ্ত পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইলাম। পড়িয়া বলিলেন, তিনিও গত কল্য পুত্রের নিকট হইতে ঐ ধরণের একখানি চিঠি পাইয়াছেন। বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, বোসো তুমি, আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে এই ধড়াচূড়াগুলো ছেড়ে মুখে হাতে একটু জল দিয়ে আসি। অনেক কথা আছে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি আমায় অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তেতলার একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তিনি ধূমপান করিতেছিলেন আমি সেইখানে গিয়া বসিলাম। তিনি আমার হাতে গুড়গুড়ির নলটি দিয়া বলিলেন, "আমার কি হয়েছে ভাই জানো? চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কাউকে আমার বলবারও উপায় নেই যে, ছেলে আমার সন্তান হয়েছে—গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করতে বেরিয়েছে। কথাটা প্রকাশ হলেই ক্রমে সাহেবদের কাণে গিয়ে উঠবে, তখন আমার চাকরী বজায় রাখাই হবে দায়।"

বলিলাম, "এখন কি উপায় হবে বেয়াই-মশাই? কোথায় সে আছে, জানতে পারলে না হয় সেখানে গিয়ে কেঁদে কেটে পড়া যায়, তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা যায়।"

বেয়াই বলিলেন, "চিঠিখানা ত লিখেছে পাবনা জেলার চন্দ্রপুর পোষ্ট আপিস থেকে। অন্ততঃ, ছাপ থেকে যা বোঝা গেল।"

"ছাপ ত আমিও পরীক্ষা করেছিলাম, কালীর ধ্যাবড়া, কিছুই বুঝতে পারিনি।"

"আমার চিঠিতে ছাপটা অত অস্পষ্ট নয়।—দাঁড়াও, চিঠিখানা বের করি।"—বলিয়া বেয়াই লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। পত্র পড়িয়া দেখিলাম, আমার কন্যার পত্রে যে সব কথা ছিল, সেই সব কথাই আছে, কেবল ভাষার একটু এদিক ওদিক। ছাপ দেখিলাম, কয়েকটা মাত্র অক্ষর পড়া গেল—চন্দ্রপুর হইতে পারে।

এই সময় ভৃত্য দুই পেয়ালা চা আনিল। বেয়াই এক পেয়ালা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এখন কিছু খাবে, ভাই? দুই এক টুকরো ফল-টল, দুই একটা মিষ্টি-টিষ্টি?"

আমি বলিলাম, "না ব্যাই-মশাই,—এই ত ঘণ্টাখানেক আগে জল খেয়েছি। এখন আর কিছু নয়। ছেলের সম্বন্ধে কি উপায় ঠাওরালেন?"

বলিলেন, "মাথা-মুণ্ড কি আর ঠাওরাব বল? চন্দ্রপুর কোথা, তাও ত জানিনে। কাল ঐ চিঠি পেয়ে, মামাকে পাবনা পাঠিয়ে দিয়েছি। পাবনায় গিয়ে প্রথমে সে খবর নেবে, চন্দ্রপুর কোথা। তারপর চন্দ্রপুরে গিয়ে সন্ধান নেবে, সেখান থেকে সেই দল কোথায় গেছে। এই রকম ক'রে যদি তাদের ধরতে পারে।"

"এই মামাটি কে ? সেই, যাঁকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন ? আপনার কি রকম মামা ইনি ?"

"দূর-সম্পর্ক। সম্বন্ধে মামা হলেও, আমার চেয়ে অন্ততঃ বছর দশেকের ছোট। দেশে থাকতো, অবস্থা খারাপ, এখানে আমার কাছে আসে চাকরীর চেষ্টায়। চাকরী বাকরী কিছু জুটিয়ে দিতে পারিনি, তবে জজ-আদালতের নকল-সেরেস্তায় ব'লে দিয়েছি, ঠিকেঠাকা কায ক'রে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে। বাকী সময় টাউটগিরি করে, উকীলদের কাছে মক্কেল ধ'রে নিয়ে যায়, ফীয়ের টাকা থেকে কিছু কিছু কমিশন পায়। লোকটা খুব চালাক চতুর আছে।"

"তার কথা কি ছেলে মানবে ?"

"ছেলের গর্ভধারিণী অনেক কাঁদাকাটা ক'রে এক চিঠি লিখে দিয়েছেন, সেই চিঠি মামা নিয়ে গেছে। কিন্তু ধরতে পারলে তবে ত !"

সকল দিক চিন্তা করিয়া, মামা না ফেরা পর্য্যন্ত এই খানেই অপেক্ষা করিব স্থির করিলাম। পরদিন সকল কথা বর্ণনা করিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিয়া দিলাম।

চারিদিন পরে মামা ফিরিয়া আসিলেন। ছেলের দেখা পান নাই, তবে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, ঐ পত্র লেখার তারিখ হইতে তিন দিন পরে, সেই স্বদেশীর দল রেলে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে গিয়া টিকিট আপিসেও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

বৈবাহিক বলিলেন, "যাক্ আর ভেবে কি হবে? অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। এখন বাবাজী যদি কেবলমাত্র স্বদেশী প্রচার করেই ক্ষান্ত হন, তা হলেও রক্ষে। কিন্তু ঐ যে লিখেছে অদূর-ভবিষ্যতে বাড়ী সার্চ হওয়া বিচিত্র নয়, এ থেকে ভয় হয়, হয় ত স্বদেশী ডাকাতি-টাকাতি করারও মতলব আছে। তা হ'লেই ধরাও পড়বেন, আর বছর চার পাঁচ শ্রীঘরে বাস। কয়েক স্থানেই ত স্বদেশী ডাকাতি হয়ে গেছে—ওঁরা ঐ রকম করেই ত দেশ উদ্ধার করার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেন কি না! আজকাল এ সব বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের খুব কড়া নজর। মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায় সার্কুলার গেছে।"

ক্ষুণ্ণ-মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

বাবাজী গ্রেপ্তার হইলে সে কথা খবরের কাগজে বাহির হইবে। বাড়ী আসিয়াই তাই কলিকাতার দৈনিক বসুমতী সংবাদপত্রের গ্রাহক হইলাম। কাগজের ঠিকানা প্রভৃতি রাজসাহী হইতেই টুকিয়া আনিয়াছিলাম।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই স্বদেশীওয়ালাদের কর্তৃক খুন বা ডাকাতীর সংবাদ বাহির হয়। খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার, বিচার ও কারাদণ্ডের কথার ত বিরাম নাই। খবরের কাগজের মোড়ক খুলিবার সময় আমার হাত কাঁপে—খুলিয়াই হয় ত দেখিব, খুন বা ডাকাতী অপরাধে আমার জামাই গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র কাটিল, বৈশাখ আসিয়া পড়িল। এক দিন

এক ভীষণ সংবাদ পাঠ করিলাম। মজঃফরপুরের উকীল কেনেডি সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা, স্থানীয় জজ কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে রাত্রে ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, কে বা কাহারা সে গাড়ীতে বোমা মারিয়া কিংসফোর্ড সাহেব ভ্রমে মেমদ্বয়কে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে—জোর পুলিস-তদন্ত চলিয়াছে। পড়িয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। হা রে ভ্রান্ত নির্ব্বোধ পাষণ্ডগণ! এইরূপ মহাপাপ করিয়া তোরা দেশ উদ্ধার করিবি? সেই সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত, পাপের ফল কি কখনও শুভ হইয়াছে, না হইতে পারে?—পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল, আমার জামাই যদি এই দলে থাকে, তবেই ত সর্ব্বনাশ! ধরা পড়িলে ফাঁসী ত অনিবার্য্য! কাগজখানা আর বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলাম না, বৈঠকখানাতেই লুকাইয়া রাখিলাম, কি জানি, যদি স্ত্রী-কন্যার চোখে পড়ে।

ক্রমে জানিতে পারিলাম, দুই জন হত্যাকারী ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন নিজেকে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, ক্ষুদিরাম বসু নামক এক যুবকের, বিচারে ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরেই কাগজে দেখিলাম, কলিকাতার মুরারি-পুকুর বাগানে পুলিস এক বোমার কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন যুবক এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে, ঐ ব্যাপারে দেশব্যাপী খানাতল্লাসী চলিতেছে, আরও কত লোক ধরা পড়িবে।—ঈশ্বর জানেন, আমার জামাইও সেই দলে ছিলেন কি না। দুশ্চিন্তায় আমার আহার-নিদ্রা একরূপ

বন্ধ হইল। খবরের কাগজ খুলিয়া প্রথমেই মৃত-ব্যক্তিদের নামের তালিকা পাঠ করি। সে দলে আমার জামাই ছিল, পুলিস যদি ইহা জানিতে পারিয়া থাকে, তবে বৈবাহিকের বাড়ী ত তল্লাস হইবে নিশ্চয়, আমার বাড়ীও হইতে পারে।

দুর্গানাম জপ করিয়া দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় আমার জামাতার নাম দেখিলাম না, আমার বাড়ীও তল্লাস হইল না। তখন কতকটা স্বস্তি অনুভব করিলাম।

৪

দ্বিতীয় পক্ষে আমার বিবাহ মৈমনসিংহ জিলায় হইয়াছিল। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। আমার শ্বশুর ৺কালীচরণ সরকার মহাশয় সেই গ্রামের এক জন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশ বাবু গৃহে বসিয়া বিষয়সম্পত্তি দেখেন, মধ্যম আশুতোষ বাবু মৈমনসিংহ বারের এক জন প্রধান উকীল, কনিষ্ঠ হরেন্দ্র বাবু জামালপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর।

আষাঢ় মাসে আমার মধ্যম শ্যালক আশু বাবুর নিকট হইতে এক নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম—৫ই শ্রাবণ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভ বিবাহ। বিবাহ-কার্য্য পৈতৃক ভিটায় আসিয়া সম্পন্ন

করিবেন। সপরিবারে যাইবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

সাত আট বৎসর হইল গৃহিণী পিত্রালয়ে যান নাই সে কারণেও বটে, সকলেরই মন খারাপ, গোলেমালে আনন্দ-উৎসবে কয়েকদিন মনের ভার কিছু লঘু হইবে সে আশাতেও বটে, এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়াই স্থির করিলাম।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সদানন্দ, বাল্যকালে একবার মাতুলালয়ে গিয়াছিল, মধ্যম হাবু ও কনিষ্ঠ বাদল মামার বাড়ী কখনও দেখে নাই—মামার বাড়ী যাইবার আনন্দে তিন জনেই নৃত্য করিতে লাগিল। যথাদিনে আমরা যাত্রা করিলাম।

শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া দেখিলাম, আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্বে গৃহখানি ভরিয়া গিয়াছে। পরদিন বিবাহ হইয়া গেল, তৎপরদিন জামাই-মেয়ে বিদায় করিয়া গৃহ বিষাদের ছায়ায় ডুবিল।

আহারান্তে কনিষ্ঠ শ্যালক হরেন্দ্র বাবুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার এলাকায় স্বদেশী হাঙ্গামা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। বলিলেন, "আমাদের হয়েছে দাদা, শাঁখের করাত। স্বদেশীওয়ালারা মনে করে, পুলিস তাদের পরম শত্রু। আবার গভর্ণমেণ্ট মনে করেন, আমরা তলে তলে স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে সহানুভূতি করি।"

এই প্রসঙ্গ যখন উঠিল, হরেনকে আমার জামাইয়ের সকল কথাই বলিলাম। আমরা কিরূপ উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতেছি, তাহাও জানাইলাম।

হরেন বলিল, "আপনার জামাইয়ের নামটি কি? সে রাজসাহীর গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের ছেলে, না?"

উভয় প্রশ্নেরই উত্তর দিলাম। হরেন বলিল, "আমার এলাকায় ও নামের কোনও স্বদেশীওয়ালা ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না, থানায় গিয়ে লিষ্টিখানা দেখতে হবে। চারিদিকে পুলিসের গোয়েন্দা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফি হপ্তায় প্রত্যেক থানা থেকে রিপোর্ট আসছে। গভর্ণমেণ্টের একেবারে কড়া হুকুম।"

হরেন মাত্র তিন দিনের ছুটী পাইয়াছিল। আগামী কল্যই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। বলিল, "দাদা, এক কায করুন না। বেরিয়েছেন যখন, একটু ভাল ক'রে বেড়িয়ে চেড়িয়ে নিন না। চলুন না জামালপুরে। আমার ওখানে হপ্তাখানেক থেকে, তার পর বাড়ী যাবেন।"

আমি সম্মত হইলাম। বিশেষ, জামালপুর মহকুমার লিষ্টিতে আমার জামাইয়ের নাম উঠিয়াছে কি না, তাহাও দেখিতে পাইব।

হরেন বলিল, "আমি ত ফিরবো ঘোড়ায়। আপনি দিদিকে নিয়ে, আপনার ছোট শালাজকে নিয়ে নৌকোয় আসুন।' ঘুরে ঘুরে যেতে হবে, পৌঁছুতে দেরী হবে বটে, কিন্তু জলপথে বেশ আনন্দ পাবেন।"

এ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।

পরদিন হরেন প্রস্থান করিল। আশু বাবু মৈমনসিং ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদির সহিত অবস্থান করিতে-

ছিলেন। মেয়ে অষ্টমঙ্গলার পর যোড়ে ফিরিয়া আসিলে, জামাই মেয়ে লইয়া তিনি মৈমনসিংহ যাইবেন। তাঁহার অনুরোধে, আমরা আর দুই দিন গোবিন্দপুরের বাটীতে অবস্থান করিলাম।

গোবিন্দপুর গ্রাম নন্দিনী নাম্নী একটী ছোট নদীর তীরে অবস্থিত। ঘাটে ভাউলে সর্ব্বদাই পাওয়া যায়; বজরাও দুই চারিখানা আছে; কিন্তু যাত্রার দিন বজরা একখানিও পাওয়া গেল না। বজরাগুলি বেশ বড় বড় হয়। তাহার ভিতর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কামরা সকল থাকে, অনেক লোক ধরে, বেশ আরামে যাওয়া যায়। অগত্যা দুইখানি ভাউলে ভাড়া করা গেল, কারণ, একখানিতে দুইটি পরিবারের সঙ্কুলান হইবে না। সকলে মিলিয়া একত্র বজরায় যাওয়ারই ইচ্ছা ছিল, সে সুযোগ না হওয়াতে উভয় গিন্নী গজ্ গজ্ করিতে লাগিলেন।

এক দিন এক রাত্রি নন্দিনী বাহিয়া গিয়া, অবশেষে আমরা বংশজ নদীতে পড়িলাম। এই বংশজ নদী, মধুপুরের জঙ্গলের ভিতর-দিয়া গিয়াছে। এই নদী জামালপুর অবধি গিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

বংশজ নদী দিয়া কয়েক ঘন্টা গিয়া যে বন্দরে আমরা সন্ধ্যার মুখে পৌঁছিলাম, সেখানে গিয়া দেখিলাম, একটি বজরা খালি হইতেছে। এক মাড়োয়ারী মহাজন নদীপথে নানাস্থানে গিয়া, চাষীদের পাটের দাদন দিয়া বেড়াইতেছিল, জামালপুর অবধি তাহার যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কি কারণে জানি না, সেইখানে নামিয়া সে বজরা ছাড়িয়া দিল। জামালপুর তখনও

এক রাত্রি ও অর্দ্ধ দিনের পথ। গৃহিণীদের আগ্রহে, সেইখানেই আমরা ভাউলে দুইখানির ভাড়া মিটাইয়া দিয়া সেই বজরা লইলাম। আকাশে মেঘ ছিল না, ত্রয়োদশীর চন্দ্র উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিতেছিল, মাঝি সানন্দে বজরা ছাড়িয়া দিল।

৫

রাত্রি ১০টায় আহারাদি শেষ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করা গেল। অনেক রাত্রিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, গরমে আর ঘুম আসিতে চাহে না। আমি বিছানা ছাড়িয়া বজরার ছাদে উঠিয়া বসিলাম।

উভয় তীরে ঘন জঙ্গল। চন্দ্রালোকে সেই জঙ্গলের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে কাটিলে, সহসা জঙ্গল হইতে দুইবার বন্দুক ডাকিল—দুড়ুম্ দুড়ুম্।

জঙ্গলের কোলে অন্ধকারে দুইখানা ছিপ বাঁধা ছিল, সেই ছিপ দু'খানা সন্‌সন্ করিয়া আমাদের বজরার দিকে আসিতে লাগিল। "ডাকাত পড়িছে কর্ত্তা"—বলিয়া মাল্লাগণ দাঁড় ফেলিয়া ঝুপঝাপ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল।

বিপদ গণিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। এক মিনিট পরেই ডাকাইতরা আসিয়া বজরায় উঠিল, শব্দে বুঝিতে পারিলাম। তাহারা দ্বারে করাঘাত করিতে

করিতে বলিতে লাগিল, "মাড়োয়ারী বাবু, এ মাড়োয়ারী বাবু, জল্‌দি দরজা খোলো।"

মুহূর্ত্তে আমি বুঝিতে পারিলাম, পূর্ব্বের সেই ধনী মাড়োয়ারী বাবুই যে এ বজরায় এখনও আছে, এই ভ্রম করিয়া ইহারা বজরা আক্রমণ করিয়াছে।

তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "জল্‌দি খোলো। কুছ ডর নেহি। রুপিয়া লেলেঙ্গে, জান ছোড় দেঙ্গে।"

সাহস সংগ্রহ করিয়া কম্পিত স্বরে আমি উত্তর করিলাম, "বাপ সকল, এ বজরায় মাড়োয়ারী ত কেউ নেই। আমরা সকলেই বাঙ্গালী, গরীব গেরস্ত মানুষ।"

তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "বলে কি রে? ভুল হ'ল না কি?"

এক ব্যক্তি বলিল, "না না, ভুল হয়নি, এই বজরাই বটে। কাল দুপুরবেলা থেকে আমি পিছু নিয়েছি। এ বেটা বোধ হয় সরকার-টরকার, মনিবকে বাঁচাবার জন্যে চালাকি করছে। দরজা ভেঙ্গে ফেল।"

দরজার উপর কুড়ালির ঘা পড়িতে লাগিল, শব্দে ইহা বুঝিলাম! বলিলাম, "না না বাপু, তোমাদের ভুলই হয়েছে। কুড়ুল থামাও, দরজা খুলে দিচ্ছি, তোমরা ভিতরে এসে স্বচক্ষে দেখ।"

কুড়ুলের ঘা থামিল। দরজা খুলিয়া দিলাম। দুই তিনটা জ্বলন্ত টর্চ্চলাইট হাতে করিয়া দশ বারো জন ডাকাত হুড়মুড়

করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তাহারা সকলেই তরুণবয়স্ক—এই আঠারো উনিশ, বড়জোর বিশ বাইশ—ইহার বেশী নহে। তা ছাড়া চেহারা ও বেশবেশ কাহারও ডাকাইতের মত নয়, সকলেই ঠিক যেন ভদ্রসন্তান। ধুতি সকলেরই মালকোঁচা-মারা, কাহারও গায়ে কোট, কাহারও শার্ট, দুই তিন জনের চোখে সোণার চশমা, দুই জনের হাতে দুইটা পিস্তল। মনে মনে বুঝিলাম, ইহারা নিঃসন্দেহ স্বদেশী ডাকাইতের দল।

টর্চ্চলাইটের সাহায্যে সর্ব্বত্র তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। একধারে গিন্নীরা তাঁহাদের বালকবালিকাগণকে বুকে আগলাইয়া গাদাগাদী করিয়া বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, একজন ডাকাইত তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "মা লক্ষ্মী সকল, আপনারা ভয় পাবেন না। স্ত্রীলোকমাত্রেই আমাদের মা, তাঁদের গায়ে আমরা হাত দিইনে, আপনারা নির্ভয়ে থাকুন।"

এক ছোকরা আমাকে ধমক দিয়া বলিল, "তোমরা কারা? এ বজরায় যে মাড়োয়ারী মহাজন ছিল, সে কোথা গেল?"

আমি বলিলাম, "আমরা মাত্র আজ সন্ধ্যেবেলা, গোয়াল-গঞ্জের ঘাটে এ বজরা ভাড়া নিয়েছি, বাবা। যে মাড়োয়ারী মহাজন এতে আসছিল, সেইখানেই সে নেমে গেল কি না। আমরা গরীব গৃহস্থ লোক, সঙ্গে টাকাকড়ি বেশী কিছুই নেই

পথ-খরচের মত সামান্য দশ বিশ টাকা আছে। এই চাবি নাও, বাক্স-তোরঙ্গ সব খুলে তোমরা দেখ বাবা।”

একজন হাত বাড়াইয়া চাবির গোছা লইল। অপর এক ব্যক্তি বলিল, “ও ড্যাম্ ইট্! দশ বিশ বি হ্যাংড্। ফেলে দে চাবি। চল্ এখন স’রে পড়া যাক্!”

ঠিক এই সময় বাহিরে দুইবার সিটির আওয়াজ হইল,—সেই বাঁশীগুলা, ফুটবল খেলিবার সময় যাহা বাজায়,—ভিতরে মটর না কাঁকর কি থাকে, ফর্ ফর্ করিয়া বাজে।

এই আওয়াজ শুনিবামাত্র সকলের মুখে ভীতি-চিহ্ন দেখা দিল। বাহির হইতে একজন কে বলিল, “পুলিসবোট। যারা যারা সাঁতার জান, জলে লাফিয়ে পড়।”

এ কণ্ঠস্বরে আমি চমকিয়া উঠিলাম। ঠিক যেন আমার জামাতার কণ্ঠস্বর!

পর-মুহূর্ত্তে ঝুপ্ ঝাপ করিয়া কয়েক জনের জলে লাফাইয়া পড়িবার শব্দ হইল। আমি বাহিরে গিয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম, দুইটা পান্সীভর্ত্তি লাল পাগড়ী—এক খানাতে স্বয়ং ইনস্পেক্টর হরেন্দ্র বাবু। বজরার গায়ে পান্‌সী লাগিবামাত্র সকলে টপাটপ্ বজরায় উঠিয়া পড়িল। এক ব্যক্তি জলে লাফাইতে যাইতেছিল, হরেন্দ্র বাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। যাহারা ইতিপূর্ব্বে জলে পড়িয়াছিল, তাহাদের ধরিতে পুলিস কোনও চেষ্টা করিল না। একজন সিপাহী বড় একটা টর্চ্চলাইট্ জ্বালিল, অপর সিপাহীরা এক এক জনে এক এক ডাকাইতকে সজোরে

জাপ্‌টাইয়া ধরিল। তাহাদেরই আলোকে আমি সভয়ে দেখিলাম, হরেন বাবু যাহাকে ধরিয়াছেন, সে আর কেহ নহে, আমারই জামাতা শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র বাবাজী!

হরেন বাবু আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? আপনি!"

আমি ইঙ্গিতে তাঁকে কথা বলিতে নিষেধ করিলাম। ভিতরে কোনও রহস্য আছে বুঝিয়া তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ধৃত আসামীদের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

তাঁহার আদেশে কনেষ্টবলরা প্রত্যেক আসামীকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল। এক এক জনকে বাঁধিয়া, ধরাধরি করিয়া পুলিসবোটে নামাইতে লাগিল।

আমি ইসারা করিয়া হরেন বাবুকে ভিতরে ডাকিলাম। ভিতরে গিয়াই তিনি বলিলেন, "আপনি দাদা এ বজরায় এলেন কি ক'রে?"

বলিলাম, "সে অনেক কথা, পরে সবই বল্‌বো। এখন উপস্থিত বিপদ থেকে বাঁচাও।"

"কেন? আর বিপদ্ কি?"

"ঐ যে ছোকরা জলে লাফিয়ে পড়ছিল, তুমি তাকে ধ'রে টেনে তুল্লে, সেই আমার জামাই।"

হরেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অ্যাঁ! তাই না কি? তা হ'লে ত বিপদই বটে।"

আমি তার হাত দু'টি ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলাম, "তোমার ভাগ্নী-জামাইকে, যেমন ক'রে পার, বাঁচাও ভাই।"

হরেন বলিল, "আচ্ছা দাঁড়ান, কি করতে পারি দেখি।" বলিয়া সে বাহির হইল। আমিও তাহার পিছু পিছু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলাম।

তাহার আদেশ অনুসারে বাকী আসামীদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধা হইতে লাগিল। আমার জামাইকেও বাঁধিল। বাবাজী কাতর ভিক্ষা-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিতে লাগিল।

একে একে সব আসামীকে পুলিসবোটে নামানো হইল, শুধু বাকী রহিল পূর্ণ। হরেনের ইসারায় আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

পূর্ণকে লইতে দুই তিন জন কনেষ্টবল বজরায় আসিল। কোনও আসামী না দেখিয়া, শুধু হরেনকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহারা বোধ হয় স্থির করিল, অন্য কনেষ্টবলরা তাহাকে পুলিসবোটে স্থানান্তরিত করিয়া থাকিবে।

হরেন কহিল, "সব আসামী ঠিক হ্যায় ?"

উত্তর হইল, "হাঁ হুজুর, সবকোইকো শিকলি চড়ায়া।"

"গিনো, কয়ঠো হুয়া ?"

তাহারা গণনা করিয়া বলিল, "আঠ আসামী হুজুর।"

"আচ্ছা, ঠিক হ্যায়।"—বলিয়া হরেন তাহাদিগকে আর আর কি সব আদেশ দিতে লাগিল।

ডাকাইতগণের ছিপ দুইখানিকে পশ্চাতে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, পুলিসের পান্সী দুইখানি খুলিয়া দিল।

আমাদের বজরার মাঝি-মাল্লারা বোধ হয় দূরে দূরে অন্ধকারে

জলে ভাসিতে ভাসিতে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল। ভিজা বিড়ালের মত একে একে তাহারা আসিয়া বজরায় উঠিতে লাগিল।

হরেন ভিতরে আসিয়া স্বহস্তে পূর্ণর হাতের বাঁধন খুলিতে খুলিতে বলিল, "কেমন হে ছোকরা, স্বদেশী করবার সখ মিটেছে ত এখন ?"

আমি বলিলাম, "আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন ?"

হরেন আমার পানে চাহিয়া চোখ টিপিয়া বলিল, "এখনি খাঁড়ার ঘা হয়েছে কি ? আপনার জামাই ব'লে যে ছেড়ে কথা কইব, তা ভাববেন না। আমরা পুলিসের লোক, বাগে পেলে নিজের বাপকেও রেয়াৎ করিনে। থানায় নিয়ে গিয়ে প্রথম ত উত্তম-মধ্যম প্রহার। তার পর হাতে হাতকড়ি দিয়ে চালান দেবো—সাতটি বছর শ্রীঘর।"

মিনতির স্বরে বলিলাম, "ছেলেমানুষ, না বুঝে একটা কায ক'রে ফেলেছে, এবার ওকে মাপ করুন—ছেড়ে দিন। আর কখ্‌খনো এমন কায ও করবে না।"

"ছেড়ে দেবো ?—ছেড়ে দিলেই ত আবার গিয়ে ঐ সব দলে মিশবে। এবার ডাকাতী ক'রেছে—এর পরে বোমা ফেলবে—মানুষ খুন করবে।"

বলিলাম, "না না, তা আর ও করবে না।"

হরেন বলিল, "কি হে ছোকরা,—ছেড়ে দিলে আবার এই সব করবে ত ?"

পূর্ণ মাথা নাড়িয়া জানাইল, আর করিবে না।

হরেন বলিল, “শুনলাম, ইনি তোমার শ্বশুর। আচ্ছা, এঁর পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করতে পার?”

পূর্ণ ঝুঁকিয়া আমার পদস্পর্শ করিয়া হরেন বাবুর দিকে তাকাইয়া রহিল।

হরেন বলিল, “বল, স্বদেশীর দলে আর আমি কখনো মিশবো না।”

পূর্ণ শপথ করিল।

“বল, আবার কলেজে ভর্ত্তি হয়ে মন দিয়ে পড়াশুনো করবো।”

সে শপথও পূর্ণ করিল।

আমি তখন পূর্ণর পানে চাহিয়া বলিলাম, “বাবাজী, উনি তোমার মামাশ্বশুর হন,—তোমার শাশুড়ী-ঠাকরুণের সহোদর ভাই। ওঁকে প্রণাম ক'রে ওঁর পা ছুঁয়েও ঐ রকম দিব্যি কর।”

পূর্ণ তাহাই করিল।

পূর্ণর পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে হরেন বলিল, “[illegible] ত হু'টো পিস্তল ছিল, কি ভাগ্যি খুন করনি কাউকে।”

পূর্ণ সলজ্জভাবে বলিল, “আজ্ঞে, গুলীর সাপ্লাই ফুরিয়ে গিয়েছিল। বারুদ ত আমরা নিজেরাই তৈরি করি।”

হরেন আমার দিকে চাহিয়া বলিল, “দাদা, দেখুন, মাঝি-মাল্লারা সব জুটেছে কি না। বজরা ছেড়ে দিতে বলুন।”

বজরা খুলিলে, আমি বলিলাম, "বাবাজীর এখন কি ব্যবস্থা করা যায় তায়া ?"

"তাই ত ভাবছি। কনেষ্টবলরা সবাই ওকে দেখেছে। জামালপুরে বজরা থেকে নেমে বাসায় যাবার সময় তারা যদি ওকে চিনে ফেলে, তা হ'লেই মুস্কিল। একখানা উড়ো চিঠির ওয়াস্তা। এক কায করা যাক না। বাবাজীকে মেয়ে সাজানো যাক। পুলিস-বোট দু'খানা আমাদের ঢের আগেই জামালপুরে পৌঁছে যাবে। ঘাটে দু'খানা ঘোড়ার গাড়ী রাখতে হুকুম দিয়েছি। একখানাতে মেয়েরা—দিদি, লীলাচীলা যাবে এখন। সেই গাড়ীতে, বউ সেজে ঘোম্‌টা দিয়ে জামাইও উঠ্‌বে। অপর গাড়ীখানায় আপনি, আমি, ছেলেরা।"

সেই পরামর্শ-ই স্থির হইল।

তার পর হরেনের কাছে ব্যাপার সব শুনা গেল। গোবিন্দপুর হইতে থানায় ফিরিয়াই সে গোয়েন্দার মুখে সংবাদ পায়, একজন ধনী মাড়োয়ারী অনেক টাকা লইয়া বজরা ভাড়া করিয়া নানাস্থানে চাষীদের পাটের দাদন দিয়া বেড়াইতেছে। স্বদেশীর একটা দল তাহার পিছু লইয়াছে—খুব সম্ভব, ডাকাতী করাই অভিপ্রায়। হরেন তাই প্রস্তুত হইয়া ছিল। তাহার এলাকায় বজরা প্রবেশ করার পর হইতেই বজরার পিছু পিছু তার পুলিস-বোট দু'খানি আসিতেছিল। মোল্লাগঞ্জ তার এলাকার বাহিরে। সেখানে আরোহী বদলের খবরটা সে পায় নাই এবং দেখা যাইতেছে, স্বদেশী ডাকাইতরাও পায় নাই।

পূর্ণ বলিল, "না, আমরাও পাইনি। আমাদের লোক মোল্লাগঞ্জের বাজারের ভিতর দিয়ে বাইসিক্লে চ'লে এসেছিল, ঘাটে ত সে যায় নি।"

হরেন বলিল, "সে মাড়োয়ারীটা বোধ হয় কি রকম ক'রে গন্ধ পেয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি মোল্লাগঞ্জে নেমে পড়েছে।"

৬

থানায় পৌঁছিয়া, হরেন আমার ও মাঝি-মাল্লাগণের এজেহার লিখিয়া লইয়া, পরদিন সাক্ষিস্বরূপ আদালতে হাজির হইবার জন্য আমাদের সমন ধরাইল।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মোকর্দ্দমা উঠিলে, দশ দিনের জন্য উহা মুলতুবী হইয়া গেল।

আমি এই অবসরে স্ত্রী-পুত্রকন্যা ও বধূবেশী জামাতাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলাম। জামালপুর মহকুমার এলাকা পার হইবার পর, সুযোগ বুঝিয়া, বাবাজীকে বস্ত্রপরিবর্ত্তন করাইয়াছিলাম—তাহাই হরেনের পরামর্শ ছিল।

জামাতাকে নিজ বাটীতেই রাখিয়া, আমি নিজে গেলাম রাজসাহীতে বেহাইকে সুসংবাদটা দিতে। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর লোক ছাড়া এ কথা কি আর কেউ জানতে পেরেছে?"

বলিলাম, "না, কারও কাছে এ কথা যাতে প্রকাশ না হয়, সেই রকম ব্যবস্থা করেছি।"

"ভাল করেছ। প্রকাশ হলে, ছেলেও যাবে, হরেন বাবুরও জেল অনিবার্য্য।"

"সে কথা সে আমায় আগেই বলেছে।"

অল্পক্ষণ চিন্তার পর বেহাই বলিলেন, "গ্রীষ্মের ছুটীতে পূর্ণ বাড়ী এল না কেন, কেউ কেউ এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলেছি, সে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে গেছে হাওয়া খেতে।"

"কলেজও বোধ হয় এত দিন খুলে থাকবে।"

"আচ্ছা, তুমি গিয়ে পূর্ণকে এখানে পাঠিয়ে দাও গে। কিংবা দাঁড়াও, কাল শনিবার আছে, কাছারীর পর আমিও তোমার সঙ্গে যাই চল। ছেলেকে, বউমাকেও সঙ্গে নিয়ে আসি। তার পর হপ্তাখানেক বাদে ছেলেকে কলকাতায় রেখে আসবো। একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল তা কি আর করা যাবে!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু মেয়েকে ঘর-বসতে পাঠাবার কোনও আয়োজনই ত আমি করিনি।"

বেহাই ছল-ছল নেত্রে ভারি গলায় বলিলেন, "সে সব পরে হবে এখন। যা আয়োজন করেছ, তারই ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারবো না, ভাই।"

দিব্যদৃষ্টি

জ্যৈষ্ঠ মাস। কলিকাতা পটলডাঙ্গায় একটি ছাত্রাবাসে আজ মহা উৎসব লাগিয়াছে। ব্যাপারটা এই—

সুরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ম্যাট্রিক ও আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াই পাস হইয়াছিল, কিন্তু বি-এ পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞান বিভাগে সে একেবারে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রথম হইবার খবর যে দিন বাহির হইল, সে দিন ছিল বুধবার।

সুরেনের পিতা জীবিত নাই—দেশে, পাবনা জেলায় চৌরীপুর গ্রামে, তাহার জননী আছেন; সুরেনের পিতৃব্যের অভিভাবকতায় তিনি বাস করেন। বাড়ীর অবস্থা তেমন ভাল নহে। তাই বি-এ পরীক্ষা কবে শেষ হইয়া গেলেও সুরেন কলিকাতায় থাকিয়া প্রাইভেট টিউশনি করিতেছে। সুরেনের বয়স তেইশ বৎসর, দিব্য সুশ্রী চেহারা, সদাই হাস্যবদন। সুরেন আজিও অবিবাহিত।

তাহার পরবর্ত্তী শনিবারে মেস-বন্ধুগণ এক সান্ধ্যভোজের আয়োজন করিল। খরচটা অবশ্য সুরেনেরই। বাসার শরৎ বাবু, বিপিন বাবু, যোগেশ বাবু, উমাপদ বাবু, যতীন্দ্র বাবু, সতীশ বাবু, ললিত বাবু ত আছেনই। বাহির হইতে অতুল বাবু,

কুমুদ বাবু ও কুঞ্জ বাবু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

ভোজন-শক্তি-বৃদ্ধিকল্পে সিদ্ধির আয়োজন হইয়াছিল। যুবকগণ সকলে একত্র হইলে, সিদ্ধি বিতরিত হইল। কেহ এক পাত্র, কেহ দুই পাত্র গ্রহণ করিলেন, মাত্র দুই জন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, সিদ্ধি তাঁহাদের মোটেই সহ্য হয় না।

কিয়ৎক্ষণ গল্প-গুজবের পর, গান-বাজনা আরম্ভ হইল। হার্মোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা সহযোগে দেড় কি দুই ঘণ্টা গান-বাজনার পর গায়ক ও বাদকেরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সিদ্ধির নেশা সকলেরই বেশ জমিয়া আসিয়াছে। আবার গল্প-গুজব আরম্ভ হইল।

সতীশ বাবু এক কোণে বসিয়া সে দিন প্রভাতের সংবাদপত্র-খানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, একটা মজার খবর শুনেছ ?"

সকলে বলিয়া উঠিল, "কি ? কি ?"

"এই যে পড়ু না শুনি—অর্থাৎ শোন না, পড়ি।"—বলিয়া তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন :—

"মফঃস্বল সংবাদ

কৃষ্ণনগর—নদীয়া

ছাত্রীর কৃতিত্ব। কৃষ্ণনগর বারের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামজীবন মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল মহাশয়ের কন্যা কুমারী কুন্দমালা দেবী বিগত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ

স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা কৃষ্ণনগরবাসী সকলেরই অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয়! এই উপলক্ষে রামজীবন বাবু সহরের তাবৎ গণ্যমান্য লোককে আগামী শনিবারে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। স্থানীয় যুব-নাট্যসমিতি নিমন্ত্রিতগণের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থ ঐ রজনীতে রামজীবন বাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণে ডি-এল্ রায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের অভিনয় করিবেন।"

ললিত চীৎকার করিয়া উঠিল—"হুর্‌রে—থ্রী চিয়ার্স ফর্ এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের কন্যা মুণ্ডমালা!"

সুরেন বলিল, "মুণ্ডমালা নয় রে, কুন্দমালা। নামটি কিন্তু বেশ মিষ্টি।"

অতুল বাবু নামক এক ভদ্রলোক দেওয়ালে হেলান দিয়া ঊর্দ্ধমুখে গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!"

ললিত বলিল, "আহা, কি আর আশ্চর্য্য? বাঙ্গালীর মেয়ের ইউনিভার্সিটিতে ফার্ষ্ট হওয়া, আজকালকার দিনে মোটেই আর আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়।"

অতুল বাবু বলিলেন, "সে জন্যে আশ্চর্য্য বলিনি হে!—আমি দিব্য-দৃষ্টিতে ব্যাপারটা যা দেখতে পাচ্ছি—তা আশ্চর্য্য! অতীব আশ্চর্য্য!"

যোগেশ বাবু বলিলেন, "দিব্য চক্ষে কি দেখছ অতুল, বলই না শুনি!"

অতুল বলিল, "এর ভিতরে প্রজাপতির হাত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

উমাপদ বলিল, "কিসের ভিতর ?"

অতুল বলিল, "প্রথমতঃ দেখ, সুরেনও কার্ট হয়েছে, কুন্দমালাও তাই।"

"দ্বিতীয়তঃ ?"

"দ্বিতীয়তঃ, সুরেনের কৃতিত্বের জন্যে আনন্দ-ভোজের আয়োজন আজ এখানে পটলডাঙ্গায়, কুন্দমালার কৃতিত্বের জন্যে আনন্দ-ভোজের আয়োজন ঠিক আজই, ঠিক এই সময়েই, কৃষ্ণনগরে চল্‌ছে।"

"তৃতীয়তঃ ?"

"তৃতীয়তঃ, সে কুমারী, আর আমাদের সুরেন্দ্র—কুমার।"

"তার পর ?"

"একজন চাটুয্যে, একজন মুখুয্যে—করণীয় ঘর।"

"আর কিছু আছে ?"

"নিশ্চয়ই আছে। যে মুহূর্ত্তে সুরেনের কাণের ভিতর দিয়া কুন্দমালা নামটি পশিল, অমনি আকুল করিল ওর প্রাণ। নামটি শুনেই ও বলেছে—খাসা মিষ্টি নামটি কিন্তু।—সুরেন, বলনি তুমি ? এই একঘর লোক সাক্ষী আছে।"

সুরেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ঠিক ঐ কথাগুলিই বলিনি, তবে ঐ ভাবের কথা বলেছি বটে।"

অতুল অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "এ বিবাহ অনিবার্য্য।"

শরৎ বলিল, "কি হে সুরেন, তুমি কি বল ? অনিবার্য্য না কি ?"

সুরেন হাসিয়া বলিল, "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনটের কোন-টাই ত মানুষের হাতে নয় ভাই। প্রজাপতির ভাই যদি নির্ব্বন্ধ হয়, তবে আমায় পরতেই হবে মাথায় টোপর, পালাবো কোথা?"

ললিত বলিল, "কি ভয়ানক কথা! আমাদের মধ্যে যে এমন একজন দিব্য-দৃষ্টিওয়ালা মহাপুরুষ বিচরণ করছেন, তা আমরা কোন দিনই সন্দেহ করিনি! আচ্ছা অতুল বাবু, মেয়েটির বয়স কত হবে?"

অতুল বলিল, "সতেরো—সতেরো বছরে পড়েছে, এখনও পূর্ণ হয় নি।"

"আচ্ছা, তার চেহারাটা কি রকম, দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছ ত?"

"আলবৎ পাচ্ছি।"

"কি রকম, বল না শুনি। কৃষ্ণা, না শ্যামা, না গৌরী?"

"গৌরী। নাম শুনেই বুঝতে পারছ না? কুন্দ ফুলের রঙ কি?"

উমাপদ বলিয়া উঠিল, "কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা, অয়ি অনিন্দিতা।"

যতীন চীৎকার করিয়া বলিল, "ওহে অতুল, এই দেখ আর একটা ভয়ঙ্কর মিল। সুরেন ভাই, সুরেন,—তোমার ভাবী প্রিয়ার একটা বন্দনা-গান গাও।"

কুঞ্জ গাহিয়া উঠিল—

"পদপ্রান্তে রাখ সেবকে।"

খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল। হাসির হিল্লোল থামিলে যতীন বলিল, "যাই বল ভাই বল ভাই, এগুলো মিল কিন্তু আশ্চর্য্য বটে!"

অতুল যতীনের পানে চাহিয়া, হাসিতে হাসিতে ভেজাইল— "দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ, হোরেশিও, দ্যান্ আর ড্রেম্‌ট্ অাফ্ ইন্ ইওর ফিলাজফি!"

ললিত বলিল, "সে যাক্—তুমি ব'লে যাও হে। মেয়েটির বয়স মাত্র সতের বছর, গৌরবর্ণা,—আর কি কি সব বল দেখি।"

"সংক্ষেপেই বলি। মুখ, চোখ, চুল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই ভাল, তবে একটু ত্রুটি আছে। চোখের তারা দু'টি মিশ কালো নয়, একটু ফিকে বাদামী রঙের। এই ত্রুটিটুকু ছাড়া, মেয়েটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বলা যেতে পারে।"

সুরেন বলিল, "ওটা কি ত্রুটি না কি? আমি ত ওটা সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বলেই মনে করি।"

এই সময় খবর আসিল, আহার্য্য প্রস্তুত। যুবকগণ আনন্দ-কলরব করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল।

২

পরদিন বিকালে ৫টার সময় যতীন বাবু কলতলায় স্নান করিতেছিলেন, দুইটি অপরিচিত ভদ্রলোক বাসায় প্রবেশ করিলেন। একজন প্রবীণ-বয়স্ক, অন্য জন যুবা-পুরুষ। প্রবীণ

ভদ্রলোক যতীন বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "এ বাসায় সুরেন্দ্র বাবু ব'লে কেউ থাকেন কি? সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী।"

যতীন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

"কৃষ্ণনগর থেকে।"

শুনিবামাত্র যতীনের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। উত্তর করিল, "সুরেন বাবু ত এখন বাসায় নেই, বেরিয়েছেন।"

"কখন্ ফিরবেন তিনি?"

"সন্ধ্যার আগেই আসবে বোধ হয়।"

"তাঁর ঘরে ব'সে আমরা কি অপেক্ষা করতে পারি?"

"নিশ্চয়। তাঁর ঘর বোধ হয় তালাবন্ধ আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতালায় ডান হাতি প্রথম ঘরটা আমার। দয়া ক'রে সেখানে ব'সে অপেক্ষা করুন, আমি স্নান সেরে আসছি।"

"আচ্ছা, থ্যাঙ্কস্"—বলিয়া বাবু দুই জন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

যতীন তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া নিজ কক্ষে গিয়া দেখিল, বাবু দুইটি দুইখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আছেন। যতীন মাথায় শুষ্ক তোয়ালে ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "আপনাদের এক এক পেয়ালা চা দিতে পারি কি?"

প্রবীণ বাবুটি বলিলেন, "দোকানের চা? না, থ্যাঙ্কস্।"

যতীন বলিল, "দোকানের চা নয়। ঐ যে ষ্টোভ রয়েছে, আমি নিজে তৈরী করবো।"

প্রবীণ ভদ্রলোক সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "আমার কষ্ট করবেন আপনি ?"

যতীন বলিল, "ষ্টোভ ত আমায় জালতেই হবে। আমি একটু খাব কি না !"

বাবুটি বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে—"

যতীন ষ্টোভ জালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া, নিজ তক্তপোষের প্রান্তে আসিয়া বসিল। বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি ?"

"শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।"

"এখানে পড়াশুনো করেন বুঝি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—সিটি কলেজে বি-এ পড়ি। এবার ফোর্থ ইয়ার।"

"বাড়ী কোথায় আপনার ?"

"আজ্ঞে, খুলনা জেলায়।"

"কোথায় ?"

"মাধবপুর গ্রামে।" একটু থামিয়া যতীন বলিল, "যদি বেয়াদবি না মনে করেন, মশাইয়ের নামটি জান্‌তে পারি কি ?"

"আমার নাম শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় মুন্‌সেফের পেস্কার। এটি আমার ভাগ্‌নে, নাম সুধীর-কুমার মুখুয্যে। ইনি সম্প্রতি ওকালতী পাস ক'রে কৃষ্ণনগরেই প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করেছেন। এঁর পিতার নাম আপনি শুনে

থাকবেন বোধ হয়, তিনি কৃষ্ণনগরের খুব নামজাদা উকীল, রামজীবন মুখুয্যে।"

গত কল্যকার আসরে, সংবাদপত্র হইতে পঠিত নামটা যেন রামজীবন বলিয়াই যতীনের মনে হইল। সন্দিগ্ধস্বরে বলিল, "রামজীবন? রামজীবন? আচ্ছা, তাঁরই মেয়ে কি এবার ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট হয়েছেন?"

সঞ্জীব বাবু বিনীত হাস্য করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ,—কুন্দমালা—আমার ভাগ্নী।"

যতীনের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা রোমাঞ্চ বহিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য, অতুল বাবু কি তবে একটা ছদ্মবেশী যোগী না কি? মানুষের দিব্যদৃষ্টি সত্যই কি তবে থাকিতে পারে? হিন্দুধর্ম্ম কি তবে নিতান্ত বুজরুকি নয়? সে মনে মনে বলিল, "নাঃ, সন্ধ্যে-আহ্নিকটা ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় নি। কাল থেকে ফের সুরু করতে হবে!"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেনের সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন, জান্‌তে পারি কি?"

সঞ্জীব বাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, তার পর বলিলেন, "আমরা শুনেছি, সুরেন বাবু এখনও অবিবাহিত। তাঁর পিতাও বর্ত্তমান নেই, নিজেই তিনি নিজের অভিভাবক। কোথাও তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে কি না, তিনি এখন বিবাহ করতে রাজি আছেন কি না, আপনি বল্‌তে পারেন?"

যতীন বলিল, "আজ্ঞে না—তা—ঠিক জানিনে।"

চায়ের জল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যতীন তিন পেয়ালা চা প্রস্তুত করিল। চা-পান করিতে করিতে সঞ্জীব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেন বাবু বি-এ ত পাস করলেন, এবার তিনি কি করবেন ? আইন-ক্লাস জয়েন করবেন কি ?"

"না, উকীল হবার তার ইচ্ছে নেই। এইবার এম-এ পড়বে।"

"বাড়ীতে ওঁর কে আছে ?"

"মা আছেন। কাকা-টাকা কাকী-টাকীও আছেন শুনেছি।"

"ক' ভাই ওঁরা ?"

"ভাই-টাই কিছু নেই। একটি বোন্ আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে।"

এই সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল। যতীন বলিল, "ঐ বোধ হয় আসছে।"

সুরেন্দ্র, যতীনের ঘরের সামনে আসিবামাত্র যতীন বলিল, "ওহে, এদিকে এস। এই ভদ্রলোক দু'টি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে ব'সে আছেন।"

"ওঃ, আচ্ছা,—আমার ঘরে আসুন।"—বলিয়া সুরেন্দ্র অগ্রসর হইল। আগন্তুকদ্বয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ঘন্টাখানেক পরে বাবুরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। যতীনের ঘরের সামনে আসিয়া সঞ্জীব বাবু বলিলেন, "আজ আসি তা হ'লে যতীন বাবু। আবার দেখা হবে, নমস্কার।"—যতীন লক্ষ্য করিল, সঞ্জীব বাবুর মুখখানি হাসি হাসি। "আজ্ঞে, আসুন,

নমস্কার”—বলিয়া সে ইঁহাদের সঙ্গে সিঁড়ি পর্য্যন্ত গেল। তার পর দ্রুতপদে সুরেনের ঘরে গিয়া দেখিল, সুরেন অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। বলিল, “ব্যাপার কি হে ?”

সুরেন চমকিয়া উঠিয়া যতীনের মুখপানে চাহিল। বলিল, “এঁরা কি জন্যে এসেছিলেন, তুমি জান যতীন ?”

“স্পষ্ট জিজ্ঞাসাই করেছিলাম হে! উত্তর দেন নি, অন্য কথা পেড়ে আমার প্রশ্নকে চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু কি জন্যে এসেছিলেন, তা অনুমান করতে পারি। কুন্দমালার সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিলেন ত ?”

সুরেন্দ্র বলিল, “হ্যাঁ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কথা, বল দেখি!”

“আশ্চর্য্য বৈ কি!”

“কিন্তু এর এক্সপ্ল্যানেশন্ কি ?”

“আমি ত কিছুই খুঁজে পাই নে।—কি হ'ল, তাই বল। রাজি হয়েছ ?”

“হয়েছি। দেখ, যাই শুনলাম, উনি কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন, কুন্দমালার মামা, আমি যেন কি রকম হতভম্ব হয়ে গেলাম। যা যা বল্লেন, তাতেই আমি হাঁ ব'লে গেলাম। আসছে রবিবারে আমি কৃষ্ণনগর যাব মেয়ে দেখতে। মেয়ে দেখে আমার পছন্দ হ'লে ওঁরা দেশে আমার কাকা-মশাইকে চিঠি লিখবেন, পরে যা যা করতে হয়, সব করবেন। আষাঢ় মাসেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান, কেন না, তার পরেই মেয়ের যোড়া বছুর পড়বে। আচ্ছা যতীন, একটা জিনিষ তুমি লক্ষ্য করেছ ?”

"কি ?"

"ওর ভাইয়ের চোখের তারা ? অতুল বাবু কুন্দ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, এরও অবিকল তাই। চোখের তারা কালো নয়, ফিকে বাদামী রঙের।"

"না ভাই, আমি ত সেটা লক্ষ্য করিনি !"

"আমি করেছি। কিন্তু যা-ই বল যতীন, অতুল বাবুর কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষমতা।"

"ব্যাপার কি, অতুল বাবুকে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করলে হয় না ? এখন ত কোনও কায নেই, চল না যাওয়া যাক্ তার বাসায়। একটু বেড়ানও হবে।"

সুরেন বলিল, "তাকে এখন কি বাসায় পাবে ? সে ত আজ চল্ল রাইবেরেলী। সেখানে একটা চাকরি জুটিয়েছে যে। এতক্ষণ বোধ হয় সে হাওড়া ষ্টেশনের পথে।"

৩

অবিলম্বে মেসের অন্যান্য লোকের মধ্যে কথাটা প্রচার হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর সকলে আসিয়া সুরেনের ঘরে জটলা আরম্ভ করিল। যোগেশ বাবু বলিলেন, "অতুলটা কি কোনও সূত্রে জানতে পেরেছিল যে, কুন্দমালার মামা তোমাকে আজ দেখতে আসবেন ? জেনে শুনে ঐ রকম চালাকি খেলে গেল না কি ?"

শরৎ বলিল, "আমি ত' তার পাশেই ব'সে ছিলাম, কিন্তু সে সময় তার মুখ-চোখ দেখে ত ওরকম আমার মনে হয় নি ভাই! বিশেষ, সে ত নিজে কোনও কথাই তোলেনি,—হঠাৎ খবরের কাগজ প'ড়ে শোনালে ত সতীশ!—সতীশ, তুমিই প'ড়ে শোনালে না ?"

সতীশ বলিল, "হ্যাঁ, আমিই ত প'ড়ে শোনালাম। কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম, হঠাৎ ঐ প্যারাটা আমার চোখে পড়লো। তারও ফার্ষ্ট হওয়ার জন্যে আনন্দ-ভোজ শনিবারেই হচ্ছে এই কথা প'ড়ে আমার ভারি মজা লাগলো, তাই তোমাদের সেটা প'ড়ে শোনালাম।"

বিপিন বলিল, "হয় ওৎলোটা জানতো, নয়, সত্যিই তার একটা ক্ষমতা আছে—ওকেই ত ক্লেয়ারভয়েন্স বলে।"

উমাপদ বলিল, "যারা সাধনার খুব উচ্চ স্তরে উঠেছে, তাদের এ রকম ক্ষমতা জন্মে, তা স্বীকার করি। কিন্তু ওৎলোটা ত মহা নাস্তিক। মুসলমানের রান্না মুর্গী ভক্ষণ করে, ওর ওরকম ক্ষমতা থাকা আমি ত অসম্ভব বলেই মনে করি। নিশ্চয়ই সে জানতো।"

শরৎ বলিল, "জানতো কি না, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলছিনে অবশ্য, কিন্তু কোন-কোনও মানুষের স্বভাবতঃ ওরকম একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে, সেটা আমি জানি। আমি যখন প্রথম বছর কলকাতায় আসি, অষ্ট্রেলিয়া থেকে একটা সার্কাসের দল এসেছিল খেলা দেখাতে। তখন বড়দিনের ছুটী। গড়ের মাঠে প্যাণ্ডাল খাটিয়ে

তারা খেলা দেখাচ্ছিল। নানা রকম খেলা হবার পর, একটা খেলা দেখালে, তা একেবারে অদ্ভুত। এক ছুঁড়ী বেদে, বয়স এই আঠারো উনিশ, সে এসে বল্লে, 'দর্শকদের মধ্যে যে কাউকে আমি ছুঁয়েই, তার জন্মবার ব'লে দেবো। যদি আমার ভুল হয়, অনুগ্রহ ক'রে তিনি যেন বলেন।' এই ব'লে সে প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারি, এক এক জনকে ছোঁয়, আর এক একটা বারের নাম ব'লে যায়, যেমন—শনিবার, বুধবার, মঙ্গলবার, শুক্রবার—এই রকম। একটি লোকও বল্লে না যে, 'না ঠিক হ'ল না, তোমার ভুল হয়েছে।' আমি তৃতীয় সারিতে ব'সে ছিলাম, খালি ভাবছি, আমার জন্মবার ত সোমবার, দেখি ঠিক বলে কি না। ঐ রকম বলতে বলতে তৃতীয় সারিতে এসে, ছুঁড়ী আমার দিকে চ'লে এল, আমাকে ছোঁবামাত্র বল্লে—সোমবার।"

অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অ্যা, বল কি? নিজে তুমি দেখেছ?"

শরৎ বলিল, "নিজে নয় ত কি প্রক্সিতে?—পাঁচটি টাকা দিয়ে টিকিট কিনে আমি ঐ তামাসা দেখতে গিয়েছিলাম। আমার মনে হ'ল, আমার টাকা খরচ সার্থক হয়েছে। তার পর আরও মজা শোন। তৃতীয় সারি শেষ ক'রে ছুঁড়ী ফিরে গেল। তার পর বল্লে, 'প্রত্যেক লোককে ছুঁয়ে, কার পকেটে কি আছে, আমি তা ব'লে দিতে পারি।' এই ব'লে আবার প্রথম সারি থেকে আরম্ভ করলে। এক এক জনকে ছোঁয় আর বলে—

রুমাল, চাবি, পেন্সিল, নস্যির ডিপে ইত্যাদি। জনপ্রাণী কেউ প্রতিবাদ করলে না। আমার সারিতে এসে, আমায় ছুঁয়ে ছুঁড়ী বল্লে—ঐ সব রুমাল চাবি-টাবি—আর একটা জিনিষ, যা বয়স্ক পুরুষমানুষের পকেটে থাকা সম্ভব নয়,—ছেলেপিলের পকেটে থাকতে পারে। বল্লে, ভাঙ্গা বিস্কুট। আমি চমকে, পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম হ্যাঁ, ভাঙ্গা বিস্কুট রয়েছে আমার পকেটে—কিন্তু সত্যি বলছি ভাই, আমার নিজেরই তা মনে ছিল না। হয়েছিল কি জান? তার চার পাঁচ দিন আগে, সেই কোট গায়ে পায়ে হেঁটে আমি সহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। চাঁদনীতে এসে বড় ক্ষিদে পায়। চারি পয়সার বিস্কুট কিনেছিলাম, খানকতক খেয়েছিলাম, খান দুই পকেটে প'ড়েছিল।—এ আমার প্রত্যক্ষ দেখা ঘটনা। কি বলতে চাও তোমরা? সে ছুঁড়ী ঋষি-তপস্বীও নয়, সাধনাও করে না, গরু-শূয়োর খায়, মদ খায়, এবং সম্ভবতঃ খারাপ চরিত্রের মেয়ে। ও কি জান? কোন-কোনও লোকের ঐ রকম একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে,—তাকে ক্লেয়ারভয়েন্সই বল, আর দিব্যদৃষ্টিই বল, আর যাই বল।"

বিপিন বলিল, "মাদ্রাজ অঞ্চলের গোবিন্দ চেট্টির কথা শুনেছ ত? এই পনর-ষোল বছর আগেকার কথা। সে সময় খবরের কাগজে প্রায়ই তার কথা বেরুতো। তবে সে ভবিষ্যৎ বলতো না, বর্ত্তমান বলতো। মাদ্রাজে সে নিজের ঘরে ব'সে তোমায় ব'লে দেবে, দেখে তোমার মা সে সময় কি করছেন, বাবা কি করছেন, তোমার স্ত্রী কি করছেন, ইত্যাদি। কলকাতা থেকে

কত লোক দেখতে গিয়েছিল। সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' কাগজে তার বিবরণ বেরিয়েছিল। মনে আছে, আমার বাবা বলতেন, 'যদি আমার দেহটা ভাল থাকতো, আমিও যেতাম।' সেই গোবিন্দ চেট্টিও শুনেছিলাম বদ্ধ মাতাল।"

কুমুদবন্ধু থিওজফি সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছিল। সেও কয়েকজন মহাত্মার আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা প্রকাশ করিল। এইরূপ আলোচনায় রাত্রি-ভোজনের সময় সমাগত হইল।

পরবর্ত্তী রবিবারে সুরেন্দ্র কয়েকজন দেশবন্ধুসহ কৃষ্ণনগর যাত্রা করিল। মেয়ে দেখিয়া সকলেই খুসী। প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিল, কুন্দমালার চক্ষুতারকা সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের মত কালো নহে, উহা ফিকা বাদামী রঙেরই বটে।

৪

আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে কুন্দমালার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে দেশ হইতে তাহার পিতৃব্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পরদিন সকলে সদলবলে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন।

শুভ-দিনে কুন্দমালার সহিত সুরেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। কৃষ্ণনগরেই কুশণ্ডিকা-ক্রিয়া শেষ করাইয়া কাকা-মহাশয় বর-কনে লইয়া দেশে গেলেন, বরযাত্রীরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

ফুলশয্যার রাত্রিতে প্রথম সম্ভাষণের পর সুরেন্দ্র নববধূকে

বলিল, "দেখ, আমাদের এ মিলন-ব্যাপারের সঙ্গে খুব একটা আশ্চর্য্য ঘটনা জড়িত আছে।"

কুন্দ কৌতূহলী হইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য ঘটনা?"

সুরেন বলিল, "যখন তোমাতে আমাতে বিয়ের কোনও কথাই হয় নি, যখন তোমার মামা আমাকে দেখতেও যান নি, তখনই আমাদের এক বন্ধু ভবিষ্যৎবাণী ক'রেছিলেন যে, তোমাতে আমাতে বিয়ে অনিবার্য্য। আমার সে বন্ধুর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ভবিষ্যতের সব ঘটনা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পান।"

কুন্দ বলিল, "বল কি? আমার নাম তোমার সে বন্ধু জানলেন কি ক'রে?"

পটলডাঙ্গার বাসায় এক মাস পূর্ব্বে শনিবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সুরেন তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। 'কুন্দমালা' নামটি শুনিবামাত্র কিছু না জানিয়াও সুরেন যে মধুর মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলিল না।

কুন্দ অবাক্ হইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। সুরেনের কথা শেষ হইলে বলিল, "খুব আশ্চর্য্য ত! তোমার সে বন্ধু নিশ্চয়ই একজন খুব ভাল গুরু পেয়েছেন, যোগসিদ্ধ বোধ হয়?"

সুরেন্দ্র বলিল, "ছাই সিদ্ধ।"

"তবে? তিনি কি করেন?"

"এই, আমরা সকলেই যা করি। অন্নের জন্যে রাত জেগে বই মুখস্থ ক'রে এগ্‌জামিন পাশ করেছেন, তার পর চাকরীর উমেদারী।—ওটা কি জান? এক একজন মানুষের ঐ রকম

একটা ক্ষমতা জ'ন্মে যায়। আপনা আপনি জন্মায়, তার জন্যে জপ-তপ সাধনা-টাধনা কিছুই করতে হয় না। ওকে বলে ক্লেয়ারভয়েন্স—ক্লিয়ার ভিশন—দিব্যদৃষ্টি আর কি। আর, ওরকম ক্ষমতা যার আছে, তাকে বলে ক্লেয়ারভয়েণ্ট।"—মুরুব্বিয়ানা-স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া সুরেন গোবিন্দ চেট্টির ক্ষমতার কথা এবং অ্যাস্ট্রেলিয়ান সার্কাস দলের সেই মেয়ের ক্ষমতার কথাও যথাশ্রুত বর্ণনা করিল।

কিয়ৎক্ষণ কুন্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর মিনতির স্বরে বলিল, "হ্যাগা, তুমি এবার যখন এখানে আসবে, তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস না। আমি তাঁকে দেখবো।"

সুরেন বলিল, "সে ত এখন কলকাতায় নেই। পাঞ্জাব গেছে চাকরী করতে। যে দিন সে ঐ সব কথা বল্লে, তার পরদিনই সে চ'লে গেছে। রাইবেরেলী হাই স্কুলের হেড মাষ্টারী চাকরী নিয়ে সে গেছে।"

কুন্দ শুইয়া ছিল, হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কি বল্লে? রাইবেরেলী ইস্কুলের হেড মাষ্টার?"

সুরেন, কুন্দমালার এই হঠাৎ উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ। কেন?"

"তোমার বন্ধুর নাম কি বল দেখি?"

"অতুল—অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।"

"ও আমার পোড়াকপাল!"—বলিয়া কুন্দ মুখে হাত চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি আর থামে না।

"কেন? কেন? হাস্‌ছ কেন?"—বলিয়া সুরেনও উঠিয়া বসিয়া, কুন্দমালার মুখ হইতে হাত টানিয়া খুলিয়া দিল।

আরও মিনিটখানেক হাসিয়া তার পর কুন্দ আত্মসম্বরণ করিতে পারিল। বলিল, "হাস্‌ছি কেন জান? তোমার সে বন্ধুটি যোগীও নন, ঋষিও নন, গোবিন্দ চেট্টিও নন, ক্লেয়ারভয়াণ্টও নন। তিনি আমার অতুল-দা। ঐ যে আমার মামা তোমায় দেখ্‌তে গিয়েছিলেন, তিনি অতুল-দার পিসে-মশাই। অতুল-দা ত কতবার এখানে এসেছেন। বাবা তাঁকে একটি ভাল পাস-করা পাত্রের সন্ধান করবার জন্তে চিঠি লিখেছিলেন, অতুল-দাই ত বাবাকে তোমার কথা লেখেন। অতুল-দা রাইবেরেলী চ'লে যাবেন ব'লেই দাদাকে নিয়ে মামা তাড়াতাড়ি ঐ দিন তোমায় দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি যখন তোমাদের ভোজের সভায় ঐ ক্লেয়ারভয়েণ্টগিরি ফলাচ্ছিলেন, তখন তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে, মামাবাবু দাদাকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিন ১০টার গাড়ীতে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা রওয়ানা হবেন। বাবা আগে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন যে!"

"তোমায় সে দেখেছে?"

"হাজার দিন।"

সুরেন কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এমন ব্যাপার? ভারি ঠকানটাই শালা আমাদের ঠকিয়েছিল ত! উঃ—আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দ্দা উঠে গেল। আমায় এক গেলাস জল দাও।"

"প্রেমের ইন্দ্রজাল"

১

অবিনাশবাবু বেলা ৫টার সময় কলেজ হইতে ফিরিয়া, নিজ শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া ধড়া-চূড়া ছাড়িতে ছাড়িতে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু পত্নী সুষমাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ভিতর-বারান্দায় ঝিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঝি, এঁরা গেলেন কোথায় ?"

ঝি বলিল, "মা ছাদে আছেন, ডেকে দিচ্চি।"—বলিয়া সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল। একটু পরেই সুষমা নামিয়া আসিল। প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে বলিল, "হ্যাগা তুমি কখন এলে ? আমি ত তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পাইনি !"

অবিনাশ বলিল, "এই ত এসে কলেজের কাপড়-চোপড় ছাড়লাম। তুমি ছাদে ব'সে কি করছিলে, বউ ?"

সুষমা একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটা রিভাইজ্ করছিলাম।"

"রিভাইজ্ শেষ হল ?"

"একটু বাকি আছে। আর ঘণ্টা-খানেক বসতে পারলে হয়ে যাবে।"

অবিনাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ তাই বল বউ! সেই জন্যেই আজ তুমি আমার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাওনি। তুমি ত এখানে ছিলে না—এ ধূলো-মাটীর পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে, কল্পনার কল্পলোকে বিচরণ করছিলে।"

সুষমা বলিল, "তুমিই ত ক'দিন থেকে আমায় পীড়াপীড়ি করছ, তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটা একটু বদ্‌লে ফেল, বদ্‌লে ফেল। ছাদে ব'সে আমি তোমারই হুকুম তামিল করছিলাম, তবে আমায় অত ঠাট্টা কেন?"—বলিয়া সুষমা ঠোঁট ফুলাইল।

অবিনাশবাবু স্নেহমিশ্রিত কৌতুকের সহিত স্ত্রীর মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "নিজের বউকে যদি একটু ঠাট্টা করবো না, অ..ন্যর বউকে করবো বল দেখি?"—বলিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া এরূপ উদ্যমের সহিত স্ত্রীর দিকে অগ্রসর হইলেন যে, সুষমা পিছাইয়া গিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "আঃ কি কর? বাইরে ঝি রয়েছে না! বুড়ো হ'তে চল্লেন তবু সখ্‌ মিটলো না। যাও হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমি ততক্ষণ তোমার জলখাবার ঠিক করিগে।"—বলিয়া সুষমা বাহির হইয়া গেল।

দশ মিনিট মধ্যেই অবিনাশবাবু হাত মুখ ধুইয়া আসিলেন। চেয়ারে বসিয়া পাথরের টেবিলের উপর রক্ষিত জলযোগ বা চা-যোগ করিতে করিতে বলিলেন, "ওগো শুনছ বউ, আজ একটা নূতন খবর আছে।"

"কি নূতন খবর?"

"ওরা ত ভয়ানক ধরেছে আমাকে।"

"ওরা কারা ?"

"এই—গোপালবাবু, উমাচরণবাবু, যোগেনবাবু, নির্ম্মলবাবু, আরও ক'জন।"—অবিনাশবাবু যে নামগুলি করিলেন, তাঁহারা সকলেই ইঁহার সহকর্ম্মী—বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রোফেসর।

সুষমা বলিল, "কি ধরেছেন, খাবেন ?"

অবিনাশবাবু মৃদু হাসির সহিত বলিলেন, "না, তোমার নাটক শুনবেন।"

"অ্যাঁ!"—বলিয়া সুষমা নিকটস্থ খাটের উপর বসিয়া পড়িল।

অবিনাশবাবু বলিলেন, "ও কি, অমন আঁৎকে উঠলে যে ? এমন কি বিপদটা হ'ল শুনি ?"

সুষমা বলিল, "আমি নাটক লিখেছি না মাথামুণ্ডু কি একটা ছেলেখেলা করেছি তার ঠিক নেই, ঐ সব মহা-মহা পণ্ডিত লোকদের ডেকে এনে তা শোনাতে হবে ?—শুনে তাঁরা কি ভাববেন বলদিকিন ? ছি ছি ছি ! আমার এমন লজ্জা করছে।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "ঐ সব মহা-মহা পণ্ডিত লোকেরা তোমার নাটক শুনে যদি ছি ছি করবেন, তোমার নাটক তবে আমার এত ভাল লাগলো কি ক'রে ? আমি তা হ'লে একটা মহামূর্খ বল !"—বলিয়া অবিনাশবাবু রাগ করিবার ভাণ করিলেন।

সুষমা বলিল, "এই দেখ, সকল কথার তুমি উল্টো মানে কর কেন বল দেখি ? আমি কি তোমায় মহামূর্খ বলেছি ? তুমিও

ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর, তাঁরাও তাই। তুমি তাঁদের চেয়ে কিসে কম?"

"তবে? আমার মতামতের কোনও মূল্য নেই কেন?"

সুষমা খাট হইতে নামিয়া আসিয়া, স্বামীর স্কন্ধে হাত বুলাইয়া বলিল, "আমার নাটক তোমার অত ভাল লেগেছে, তা কেবল, তুমি আমায় অত ভালবাস ব'লে। আবার তাদের বউ যদি নাটক লিখতো, তবে তাদেরও খুব ভাল লাগ্‌তো।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "জানিনে,—আমার ধারণা ছিল, ভাল জিনিষ সবাইকেরই ভাল লাগে। তাই আমি গর্ব্ব ক'রে তাদের কাছে কথাটা বলেছিলাম।"

"তুমি তাঁদের কাছে কি বলেছ বল দেখি? নিশ্চয়ই অযথা খুব বাড়িয়ে বলেছ।"

"অযথা কেন বল্‌বো? যথাই বলেছি।"

"ঠিক কি কথা তাঁদের তুমি বলেছ, সত্যি ক'রে আমায় বল দেখি!"

"বলেছি, নাটকখানি খুব ভাল হয়েছে।"

"ব্যস্, আর কিছু না? সত্যি ক'রে বল।"

অবিনাশবাবু ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আর বলেছি, গিরীশ ঘোষের প্রফুল্ল নাটকের পর, এ রকম ভাল গার্হস্থ্য নাটক বাঙ্গলা সাহিত্যে আর জন্মায় নি। তা সত্যি কথা যা, তাই বলেছি। তাতে দোষটাই বা কি হয়েছে, আর রাগে তুমি ভুরুই বা কোঁচকাচ্ছ কেন?"

সুষমা বলিল, "আচ্ছা, সত্যি হোক মিথ্যে হোক তুমি ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ কর কেন বল দেখি? এটা কিন্তু তোমার একটা রোগ—তা তুমি যাই বল। আমি গোপনে একটা ছেলে-মানুষী করলাম,—শুধু তুমি জানলে আর আমি জানলাম। তাই নিয়ে কি বাইরে ঢাক পিটোতে হয়?"

"ঢাক আমি না পিটোলে ঢাক যে আপনি পিটে যাবে বউ! তার উপায় কি বল?"

"ঢাক আপনি পিটুবে কেন?"

"বই ছাপাতে হবে না?"

"কেন, আবার কিছু লোকসান দেবার ইচ্ছা হয়েছে? বিয়ের অল্পদিন পরেই কত খরচপত্র ক'রে আমার কবিতার বই ছাপিয়ে ছিলে। বিক্রী হল? তারপর আমায় অনুরূপা নিরুপমা বানাবার চেষ্টায় দিলে আমায় 'উপন্যাস-কলেজে' ভর্তি ক'রে। কলেজ থেকে বেরিয়ে ক্রমাগত বলতে লাগলে, একখানা উপন্যাস লেখ উপন্যাস লেখ। কি করি, তোমার পীড়াপীড়িতে উপন্যাস লিখলাম। 'তাও ছাপালে গ্রন্থ হল নগদ মূল্য এক টাকা।' কোনও রকমে খরচটা উঠে গিয়েছিল,—আর বিক্রী হয়? যে প্রথম সংস্করণ সেই প্রথম সংস্করণেই মা আমার বিরাজ করছেন ত!"

ঝি অবিনাশবাবুর গুড়গুড়ি প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিল। অবিনাশবাবু ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "প্রেমের ইন্দ্রজাল বেরুলে হয়ত প্রথমটা তেমন বিক্রী নাও হতে পারে, কিন্তু

থিয়েটারে যখন প্লে হতে আরম্ভ হবে—তখন হুহু ক'রে বিক্রী হতে থাকবে যে, এডিশনের পর এডিশন উড়ে যাবে—তা জান ?"

সুষমা বলিল, "থিয়েটারে প্লে হলে ত ?"

"যত সব রাবিশ নাটক প্লে হচ্চে, আর তোমার নাটক প্লে হবে না ?"

"আমার নাটক যে রাবিশ-তরো নয়, তা কে বল্লে ?"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "আমি বলছি। রবিবার দিন ওঁরা সব আসছেন ত ? সেই সব মহা-মহা পণ্ডিত লোক যখন শুনবেন, তখন তাঁরাও বলবেন। তুমি একা রাবিশ বল্লে ত চলবে না গো !

পুষ্প সম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা

দেখনি নিজে মোহন কি যে তোমার মালিকা !

ছড়িগাছটা দাও, হরিশ পার্কে একটু বেড়িয়ে আসি। ফিরে এসে রবিবার সম্বন্ধে দু'জনে পরামর্শ করা যাবে।"

২

এ কয়দিন ধরিয়া অবসর সময়টুকু স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া নাটকখানি বারংবার পাঠ করিয়া, মন্ত্রণা করিয়া, কথা বদলাইয়া, দৃশ্য বদলাইয়া, মাজিয়া-ঘষিয়া শনিবার রাত্রে উহার প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন করিল। কাল রবিবার। অবিনাশবাবুর সহকর্মী সাত জন অধ্যাপক—এবং অবিনাশবাবুর ক্লাসের একজন মেধাবী ছাত্র

পঞ্চানন বসু—বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজি-সাহিত্যে সে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই আট জনকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। বেলা ৫টার সময় তাঁহারা আসিয়া অবিনাশ বাবুর গৃহে সমবেত হইবেন। চা-পানের পর নাটক পড়া আরম্ভ হইবে। পড়িতে তিন ঘণ্টার কম লাগিবে না। তারপর রাত্রি-ভোজন। এইরূপ পরামর্শ-ই হইয়াছে।

রবিবার প্রাতে চা-পান সমাধা করিয়া অবিনাশবাবু বাজার করিতে গেলেন। ফর্দ্দ অনুসারে কাঁচা ও পাকা বাজার করিয়া সে সব বাড়ীতে আনিয়া ফেলিয়া, ট্রামযোগে মিউনিসিপল্ মার্কেটে গমন করিলেন কেবল মটন্‌টার জন্য—আর সব ত জগুবাবুর বাজারেই পাওয়া গিয়াছে।

রন্ধন জন্য দুই জন উড়ুইয়ে-ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহারা রাঁধিয়া, পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইয়া যাইবে। বেলা ২টার পর ব্রাহ্মণেরা হুঁকা হাতে করিয়া আসিয়া নিম্নতলের পাকশালা দখল করিল। চা ও জল-খাবার প্রস্তুতের ব্যবস্থা সুষমা নিজের হাতে রাখিয়াছিল; উহা দ্বিতলে ষ্টোভ জ্বালাইয়া সম্পন্ন হইবে।

পাঁচটার পর নিমন্ত্রিতগণ একে একে, দুইয়ে দুইয়ে আসিতে লাগিলেন। সকলে আসিয়া জমায়েৎ হইতে সাড়ে-পাঁচটা বাজিয়া গেল। ঝির সহায়তায় অবিনাশ-বাবু চা ও জলযোগের দ্রব্যাদি বৈঠকখানায় আনিতে লাগিলেন।

চা-পর্ব্ব যখন শেষ হইল তখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

গোপালবাবু এই অধ্যাপক দলের মধ্যে প্রবীণতম, তিনি বলিলেন,—"এবার নাটকখানি বের কর হে অবিনাশ।"

অবিনাশবাবু দ্বিতলে গিয়া, নাটকের খাতা হাতে সুষমাকে লইয়া নামিয়া আসিলেন। বৈঠকখানা ঘরের পাশেই আর একটি ঘর ছিল, লোকটা-জনটা আসিলে এই ঘরেই শয়নের ব্যবস্থা হইত। উভয় ঘরের মাঝে একটা দ্বার ছিল, এই দ্বারটির উপর পর্দ্দা ফেলা ছিল। পর্দ্দার অনতিদূরে একখানি চেয়ার পাতিয়া তাহাতে সুষমাকে বসাইয়া, অবিনাশবাবু বৈঠকখানা ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি খুবই ছিল, কিন্তু তথাপি উত্তমরূপে পাঠ করিতে অবিনাশবাবুর কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না; কারণ বারংবার পড়িয়া পড়িয়া উহা প্রায় তাঁহার কণ্ঠস্থই হইয়া গিয়াছিল। অবিনাশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক—সাহিত্য-রসজ্ঞান তাঁর ভালই ছিল। বেশ দরদ দিয়াই তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রথমেই গোপালবাবু বলিয়া রাখিয়াছিলেন, পাঠ শেষ না হইলে কোনও শ্রোতা যেন কোন সমালোচনা না করেন। তথাপি শ্রোতৃগণ স্থানে স্থানে "বাঃ, কি সুন্দর!" "কি চমৎকার!" "খাসা হয়েছে এখানটি", ইত্যাদি মন্তব্য করিতে ছাড়িলেন না। এইরূপ এক একটা মন্তব্য শুনিয়া অবিনাশ-বাবুর কণ্ঠস্বর ভাবোচ্ছ্বাসে আর্দ্র হইয়া উঠে, পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া সুষমার দেহেও রোমাঞ্চ উৎপাদিত হয়।

পাঠ যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকা। সকলেই বলিলেন, প্রথম প্রয়াসের পক্ষে নাটকখানি বেশ ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। স্থানে স্থানে চরিত্রগুলিও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ গানগুলি বেশ সুন্দর। কেহ কেহ বলিলেন, ইহা কোনও ভাল থিয়েটারে অভিনয়ার্থ দেওয়া উচিত, গুণের আদর নিশ্চয়ই হইবে।

নির্ম্মলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বইখানি ছাপাচ্ছেন ত?"

উমাচরণবাবু বলিলেন, "না হে, আগে ছাপিও না। আগে কোনও থিয়েটারে খাতাখানি দাও। ওরা ত জিনিসটে ঠিক সাহিত্যের দিক থেকে দেখবে না, ওরা দেখবে ষ্টেজে এটা জমবে ভাল কি না। সেই জন্যে ওরা অনেক সময় নাট্যকারকে দিয়ে স্থানে স্থানে বদল-সদল করিয়ে নেয়, হয়ত একটা সীনকে সীনই বাদ দেয়, কিংবা নাট্যকারকে দিয়ে লিখিয়ে একটা নূতন সীনই ঢুকিয়ে নেয়। সেই সবগুলো হয়ে গেলে তারপর বই ছাপানো ভাল।"

গোপালবাবু মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, "না হে অবিনাশ, তা কোরো না। তোমার মত একটা লোকের পক্ষে, নাটকের খাতা বগলে ক'রে আর পাঁচটা ছেঁড়া নাট্যকারের সামিল হয়ে থিয়েটারের কর্ত্তাদের কাছে হেঁইগো মশাই হেঁইগো মশাই ব'লে দরবার করতে যাওয়া—সেটা বড়ই অপমানজনক হবে। আমি কি চাই জান? আমি চাই, বইখানি ছাপা হোক,—কাগজে কাগজে তার সমালোচনা বেরুক, থিয়েটার-

ওয়ালারাই এসে অভিনয়ের অধিকারের জন্তে তোমার কাছে দরবার করুক। কি বল হে যোগেন ?"

গোপালবাবুর এই যুক্তিই সকলে মানিয়া লইলেন। অবিনাশবাবুর প্রিয়ছাত্র পঞ্চানন একজন কবি, নানা মাসিক পত্রিকার সহিত তাহার সম্পর্ক আছে, কবিতার বহিও সে দুইখানি ছাপাইয়াছে। প্রেস ঠিক করিবার, প্রুফ দেখিবার ও সমালোচনা বাহির করাইবার ভার সে গ্রহণ করিল।

৩

"প্রেমের ইন্দ্রজাল" নাটক আজ ছয় মাস হইল প্রকাশিত হইয়াছে, কাগজে কাগজে উহার উচ্চ প্রশংসাযুক্ত সমালোচনাও বাহির হইয়াছে," কিন্তু কোনও থিয়েটারের অধ্যক্ষ এখনও উহার অভিনয় অধিকার লাভের জন্য অবিনাশবাবুর নিকট দরবার করিতে আসিলেন না।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। গুরুদাস লাইব্রেরী হইতে হিসাব পাওয়া গেল, ছয় মাসে মোট সত্তর খানি মাত্র বহি বিক্রয় হইয়াছে।

হিসাব দেখিয়া সুষমার মুখখানি মলিন হইয়া গেল। অবিনাশবাবুর বুকটিও অত্যন্ত দমিয়া গেল। কিন্তু মনের সে ভাব তিনি গোপন করিয়া সুষমাকে বলিলেন, "দেখ বউ, এতে নিরুৎসাহ হবার কিছুই নেই। এ ত উপন্যাস নয়, এ হল নাটক।

নাটক প্রধানতঃ কোথায় বিক্রী হয় জান? থিয়েটারে, অভিনয়ের সময়। থিয়েটার দেখতে গিয়েই লোকে নাটক কেনে। নইলে শুধু ঘরে ব'সে পড়বার জন্যে নাটক কেনে খুব অল্প লোকেই।"

সুষমা বলিল, "কিন্তু ওঁরা যে বলেছিলেন, বই বেরুলে থিয়েটারওয়ালারা অভিনয় অধিকারের জন্যে আমাদের দরজার মাটি চ'ষে ফেলবে, তাই বা কোথায়? কাগজে কাগজে বইয়ের যে অত সুখ্যাতি বেরুল, তারই বা ফল কি হল?"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "হ্যাঃ তুমিও যেমন! ঐ সব মাসিক পত্র-টত্র থিয়েটারওয়ালারা পড়ে বুঝি? তাদের সময় কোথা? এমন একখানা ভাল নাটক যে বেরিয়েছে, সে খবরই এখনও হয়ত তাদের কাণে পৌঁছয় নি। বই যে খুব ভালই হয়েছে, তার প্রমাণ ত ঐ সব সমালোচনা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।"

"সব সমালোচনাই বোধ হয় তোমার ঐ ভক্তিমান্ ছাত্র পঞ্চাননেরই লেখা। সব কাগজেই ও কবিতা লেখে,—কাগজ-ওয়ালাদের সঙ্গে খাতির আছে,—সে যা সমালোচনা লিখে দিয়েছে তাই বোধ হয় তারা ছেপেছে।"

যদিও পঞ্চানন স্পষ্টতঃ এ কথা স্বীকার করে নাই,—তথাপি অবিনাশবাবুরও মনে মনে সন্দেহ ছিল যে, সমালোচনাগুলি তাহার কর্তৃক,—অন্ততঃ তাহারই ইঙ্গিতে লিখিত। সুতরাং এ কথার জবাব না দিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু, যেদিন নাটক পড়া হল, ইউনিভার্সিটির অতগুলো দিগ্‌গজ প্রোফেসার, তাঁরা কি বলে-

ছিলেন তোমার মনে নেই?—তুমি কি বলতে চাও, তাঁদের সে প্রশংসা আন্তরিক নয়, কপটতা-পূর্ণ?"

সুষমা বলিল, "তাঁদের প্রশংসা যে কপটতা-পূর্ণ সে কথা আমি বলতে চাই নে। সত্যিই তাঁদের ভাল লেগে থাকবে,—তাঁরা যা বলেছেন, সে তাঁদের আন্তরিক কথাই সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল দিক বিবেচনা ক'রে দেখ। তাঁরা সকলেই তোমার বন্ধু, তোমায় স্নেহ করেন, ভালবাসেন। বাঙ্গলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার এই অবস্থার দিনে, তাঁদের এক প্রিয়বন্ধুর স্ত্রী বই লিখেছে এই সংবাদেই তাঁরা খুসী। তুমি আদর ক'রে বই শুনতে তাঁদের নিমন্ত্রণ করেছ—তাঁরা ও বই ভাল লাগবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তা ছাড়া, আগে থেকেই বইয়ের প্রশংসা ক'রে তুমি তাঁদের মনও ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলে। তাঁরা জিনিষটাকে দেখেছেন স্নেহের বন্ধুপ্রীতির রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে, সুতরাং ঠিক দেখেন নি।"

স্ত্রীর এই বক্তৃতা শুনিয়া অবিনাশবাবু কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "সে যা হোক, আমি কি স্থির করেছি জান? যস্মিন দেশে যদাচারঃ। এ য়ুরোপ নয়—ঘরে ব'সে থেকে গুণী তার ন্যায্য প্রাপ্য পায় না। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে গুণীকে তার প্রাপ্য আদায় ক'রে নিতে হয়। পঞ্চাননের সঙ্গে ডায়মণ্ড থিয়েটারের ম্যানেজারের আলাপ আছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি একদিন যাই, গিয়ে বই একখানা দিয়ে আসি। তুমি কি বল?"

সুষমা একটু ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি যা ভাল বোঝ, কর। আমি আর কি বলবো?"

৪

আরও ছয় মাস কাটিল। নাটকখানি পঞ্চাননের ওকালতী সত্বেও "ডায়মণ্ড" থিয়েটার ফেরৎ দিয়াছে। তারপর "অ্যাভিনিউ" থিয়েটার, তারপর "বীণাপাণি" থিয়েটারে চেষ্টা করা হইয়াছিল, ফল পূর্ব্ববৎ। পাণ্ডুলিপিখানি এখন "লীলা" থিয়েটারের হস্তে— তাঁহারা কি করেন বলা যায় না।

"প্রেমের ইন্দ্রজাল"খানি সুষমা বাস্তবিক প্রাণ দিয়া লিখিয়াছিল। মুখে সে ইহাকে রাবিশ বলুক আর যাহাই বলুক, অন্তরের অন্তস্তলে তাহার বিশ্বাস যে নাটকখানি উচ্চদরের হইয়াছে। তাই বহি বিক্রয়ের হিসাব দেখিয়া এবং উপর্য্যুপরি তিনটি থিয়েটার হইতে নাটকখানি ফেরৎ আসায় সে বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছে।

ভাদ্র মাসে একদিন ভিজাকাপড়ে ঘণ্টাখানেক গৃহ-কার্য্য করায় সুষমার জ্বর হইয়া পড়িল। তিন চারি দিন জ্বরভোগের পর উহা ছাড়িল বটে, কিন্তু পরদিন আবার প্রবলতর বেগে দেখা দিল। সারা ভাদ্র মাস এইরূপ চলিল। ইহাতে সুষমার দেহ বলিতে গেলে কঙ্কালসার হইয়া পড়িল।

অবিনাশবাবু যে কয় ঘণ্টা কলেজে থাকেন, তা ছাড়া সমস্তক্ষণ রুগ্না পত্নীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটান। তাঁহার বন্ধুবর্গ প্রত্যহ সুষমার অবস্থার সংবাদ লন।

সুষমা এখন অনেক সময় অজ্ঞান অবস্থায় থাকে। একদিন জ্ঞান হইলে সে স্বামীকে বলিল, "ওগো, দেখ আমি ভারি চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখেছি। যেন একটা প্রকাণ্ড বড় হল, তার শেষে ষ্টেজ, সেই ষ্টেজে যেন "প্রেমের ইন্দ্রজাল" প্লে হচ্চে লোক একেবারে গিস্ গিস্ করছে। কত সব সাহেব মেম পর্য্যন্ত দেখতে এসেছে। তোমাকেও দেখলাম সেই সাহেব মেমদের দলেই। আমি যেন দোতালায় চিকের আড়ালে ব'সে আছি। আচ্ছা লীলা থিয়েটারের হলটা কি খুব বড় ?"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "তাদের হল ত আমি দেখিনি। দু'তিন দিন শুধু ম্যানেজারের বসবার ঘরে ঢুকেছিলাম।"

"ওগো, তুমি যাও না একদিন, ম্যানেজার কি বলে জেনে এসো।"

"তোমায় ফেলে কি ক'রে আমি যাই বউ ?"

"তা হোক, তুমি যাও একদিন। কালই যাও না কলেজের পর। এত যখন দেরি হচ্ছে, তারা বোধ হয় নেবে ঠিক করেছে। ফিরে আস্‌বার হ'লে এতদিনে আস্‌তো বোধ হয়। ডায়মণ্ড থেকে, অ্যাভিনিউ থেকে, বীণাপাণি থেকে ফিরতে ত এত দেরি হয়নি।"

"আচ্ছা দেখি, যদি কাল সময় করতে পারি।"—বলিয়া

অবিনাশবাবু ঘড়ি দেখিয়া, রোগিণীর মুখে চামচে করিয়া বেদানার রস দিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে ডাক্তারবাবু আসিলে, অবিনাশবাবু তাঁহাকে রোগিণীর অবস্থা, বিশেষ করিয়া ঐ স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত, খুলিয়া বলিলেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "মনটা অত খারাপ ব'লেই চিকিৎসার তেমন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। ঈশ্বর করুন লীলা থিয়েটার ওঁর নাটকখানি নেয়!" সেদিন কলেজের পর, পঞ্চাননকে সঙ্গে লইয়া অবিনাশবাবু লীলা থিয়েটারে গমন করিলেন। ম্যানেজারবাবু বলিলেন, "না মশাই, বইখানি চ'লবে না—এই নিন্" বলিয়া পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিলেন।

গুরুপত্নীর রোগের অবস্থা, তাঁহার স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত, ডাক্তারবাবুর উপদেশ, পঞ্চানন সমস্তই অবগত ছিল। শিক্ষক ও ছাত্র অত্যন্ত বিমর্ষ মনে ফিরিতেছিলেন। পঞ্চানন হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, "স্যার!"

অবিনাশবাবু দাঁড়াইলেন। পঞ্চাননের মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চক্ষু দুইটি ব্যাকুল মিনতি-পূর্ণ। বলিলেন, "কি হে?"

পঞ্চানন বলিল, "স্যার, আমি একটা অন্যায় কর্ম্ম করবো—একটা মিথ্যে কথা বল্‌বো, আমায় অনুমতি দিন। আমি মাকে গিয়ে বল্‌বো, 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' লীলা থিয়েটার নিয়েছে—বই রিহার্সালে পড়েছে—আসছে শনিবারের পরের শনিবারে প্লে আরম্ভ হবে।"

অবিনাশ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওঃ, চল। আচ্ছা ভেবে দেখি।"

বড় রাস্তার মোড়ে আসিয়া অবিনাশবাবু ট্রামের জন্য দাঁড়াইলেন। পঞ্চানন বলিল, "স্যার্, আপনার বোধ হয় মিথ্যেকথা তেমন সহ্য হয় না, আপনার এখন বাড়ী গিয়ে কায নেই। আমি বাড়ী গিয়ে মাকে ঐ কথা বলিগে। তাঁকে বলবো যে বিশেষ কাযে আটকে প'ড়ে আপনি লীলা থিয়েটার যেতে পারেন নি, আমাকে পাঠিয়েছিলেন, আমি গিয়ে দেখ্‌লাম অ্যাক্‌চুয়ালি রিহার্সল চলচে। তাই ছুট্‌তে ছুট্‌তে স্যার্‌কে খবর দিতে এসেছি, স্যার্ কৈ ?"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তাই না হয় বলগে। আমি গোপালবাবুর বাড়ীতে খানিক ব'সে তার পর যাব এখন।"

পঞ্চানন বলিল, "আর স্যার্, খাতাখানি কাইগুলি উপরে নিয়ে যাবেন না, বৈঠকখানা ঘরে দেরাজে বন্ধ ক'রে তার পর উপরে যাবেন।"

"বেশ, তাই করবো।"—বলিয়া উভয়ে ট্রামে উঠিলেন। অবিনাশবাবু, চোরবাগানের মোড়ে নামিয়া, গোপালবাবুর বাড়ীর দিকে চলিলেন।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ী পৌঁছিয়া অবিনাশবাবু দেখিলেন; সুষমা নিদ্রিত, তাহার গালে চোখের জলের দাগ।

ঘণ্টা খানেক পরে সুষমা জাগিয়া বলিল, "ওগো, পঞ্চাননের সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি ?"

"হ্যাঁ, রয়েছে বৈকি! তাকে লীলা থিয়েটারে পাঠিয়েছি। ম্যানেজার কি বল্লে কাকে বলেছে বোধ হয় শুনতে পাব তার কাছে।"

সুষমা ক্ষীণস্বরে বলিল, "সে এসেছিল ঘন্টাখানেক আগে। ওরা বইটে নিয়েছে—রিহার্সাল চলচে—পঞ্চানন দেখে এসেছে। আসছে শনিবারের পরের শনিবারে নাকি খুলবে বলেছে!"

অবিনাশবাবু মুখে কৃত্রিম হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "নিয়েছে? আঃ, বাঁচা গেল। আজ হ'ল কি বার? বুধবার। বুধে বুধে আট, বৃহস্পতিতে নয়, শুক্রে দশ, শনিতে এগারো। এগারো দিন পরে প্লে আরম্ভ হবে, প্রথম রজনীতে আমরা দু'জনে দেখতে যাব না? তুমি শীগ্‌গির ভাল হয়ে নাও।"

সুষমা বলিল, "দেখি চেষ্টা ক'রে!"

সুষমার বেদানার রস পান করিবার সময় হইয়াছিল। উহা পান করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

অবিনাশবাবু লক্ষ্য করিলেন, তাহার মুখে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

৫

এই কাল্পনিক শুভসংবাদ বাস্তবিকই সুষমার ব্যাধিতে মহৌষধির কার্য্য করিল। দিন দিন সে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল।

পঞ্চাননের পরামর্শে বিজ্ঞাপনের ভয়ে বাড়ীতে সংবাদ-পত্রের

প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সে মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার গুরুপত্নীকে রিহার্সাল-সম্বন্ধে নানা কাল্পনিক-কাহিনী বলিয়া যায়।

শুক্রবার আসিল। সুষমার জ্বর আর নাই, কিন্তু, আজিও সে অন্নপথ্য করে নাই। স্বামীকে বলিল, "ওগো আমি ত পারলাম না, তুমি কাল থিয়েটারে যাও, কি রকম অভিনয় হয়, লোকে তা কি ভাবে নেয়, জেনে এস।"

অবিনাশ বলিল, "পাগল! আমি যাব একা, প্রেমের ইন্দ্রজাল দেখ্‌তে? যখন যাব, দু'জনে যাব, তুমি শরীরে একটু বল পাও আগে। পঞ্চাননকে পাঠিয়ে দেবো, সে দেখে এসে বলবে প্লে কেমন ওৎরালো।"

সুষমা আর কোনও কথা বলিল না।

"প্রেমের ইন্দ্রজাল"এর পাণ্ডুলিপি পঞ্চানন পূর্ব্বেই চাহিয়া লইয়া গিয়াছিল। উহা হইতে সে একখানি প্রোগ্রাম ছকিয়া তাহা ছাপাইয়া লইল। উপরে লীলা থিয়েটারের নাম, তারপর পাত্র পাত্রীর পরিচয়, অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক—এমন কি শেষে ইংরাজি হরপে ছাপা ম্যানেজারের নামটি পর্য্যন্ত।

রবিবার প্রাতে, এই প্রোগ্রাম হাতে লইয়া সে অবিনাশবাবুর গৃহে আসিল এবং অভিনয়-সম্বন্ধে অনর্গল অনেক কাল্পনিক-কাহিনী বলিয়া গেল। এমন কি, অভিনয়-কালে একজন মাতাল পার্শ্ববর্ত্তী দর্শকের গাত্রে বমি করিয়া দিয়া কি ভাবে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয় তাহাও জানাইল।

৬

তিন দিন পরে সুষমা অন্নপথ্য করিল। ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন, যত শীঘ্র সম্ভব ইঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। পূজার ছুটি হইতে সপ্তাহ মাত্র বাকী, সে সপ্তাহ অবিনাশবাবু ছুটি লইয়াছেন। শুক্রবার দিন ছিল ভাল, ঐ দিন পঞ্জাব-মেলে তিনি সস্ত্রীক চুণার যাত্রা করিলেন।

চুণারে সুষমার স্বাস্থ্য দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। দুই মাস পরে স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় অবিনাশবাবু ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া সুষমা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' এখনও লীলা থিয়েটারে হচ্চে?"

"না,—তারা এখন অন্য বই আরম্ভ করেছে।"

"তাইত! আমাদের যে দেখা হল না।"

"না, পেশাদারী থিয়েটারে, দেখা হল না বউ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে সখের দল আছে, লাটসাহেব কলকাতায় ফিরলেই তারা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিচ্যুটে 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' অভিনয় করবে।"

এ কথাটা সত্য—কাল্পনিক নয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে পঞ্চাননই ছিল প্রধান পাণ্ডা।

সুষমা সত্যই একদিন দ্বিতলে চিকের আড়ালে বসিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক "প্রেমের ইন্দ্রজাল"এর অভিনয়

দেখিল। অনেক সাহেব মেম আসিয়াছেন তাহাও দেখিল। দ্বিতীয় অঙ্কে ড্রপ পড়িলে কে এক সাহেব তাহার স্বামীর সহিত করমর্দ্দন করিয়া হাসিয়া হাসিয়া কি সব কথা বলিতে লাগিলেন। তার পরেই সাহেব, অন্য কতকগুলি সাহেব ও মেমের সহিত বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়ী আসিয়া সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা সে সাহেবটা কে গা? তোমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড ক'রে হাসতে হাসতে কথা কইছিল দেখলাম।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "সে সাহেব কে শুন্‌বে? বড় কেউ কেটা নয়, স্বয়ং লাটসাহেব। তিনি যখন উঠলেন, আমাদের ভাইস্‌চ্যান্সলার আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে এই বলে পরিচয় ক'রে দিলেন—'ইনিই এই নাটকের রচয়িত্রীর স্বামী—আমাদের একজন সম্মানিত অধ্যাপক।"

"শুনে লাটসাহেব কি বল্লেন?"

"বল্লেন, তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। তোমার প্রতিভাশালিনী পত্নীকে আমার সম্মান ও অভিনন্দন জানাইও।"

ইহার পর সুষমা যখন শুনিল যে "প্রেমের ইন্দ্রজাল" কোনও দিনই লীলা থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই, প্রোগ্রামখানি পর্য্যন্ত জাল, ঐ সংবাদ তাহার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সস্নেহ ষড়্‌যন্ত্র মাত্র—তখন আর তার মনে বিশেষ দুঃখ হয় নাই।

হারাণো মেয়ে

১

বহুকাল পশ্চিমে সমরবিভাগে চাকরি করিয়া ৫৭ বৎসর বয়সে সারদাবাবু পেন্সন লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, জীবনের শেষ বৎসর কয়েকটা পিতৃপিতামহের ভিটায় কাটাইয়া দিবেন।

সপরিবারে দেশে ফিরিয়া, ঘর-দুয়ার কতক কতক মেরামৎ করিয়া, নিজ গ্রামে তিনি বসবাস আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মনও টিকিল না, তাহার উপর ম্যালেরিয়ার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন সারদাবাবু গ্রামের বাস উঠাইয়া, কলিকাতায় আসিয়া, ভবানীপুরে একটী দ্বিতল বাটী খরিদ করিয়া স্থায়ী হইয়া বসিলেন।

তাঁহার দুই পুত্র তিন কন্যা। বড় ছেলেটী লাহোরে চাকরি করিতেছে এবং সপরিবারে সেখানেই আছে। ছোট ছেলে লাহোর কলেজে বি-এ পড়িতেছে। বড় মেয়েটীর বিবাহ হইয়াছে, সে নিজ শ্বশুরালয় লক্ষৌয়ে থাকে। ছোট মেয়ে চৌদ্দ বৎসরে পড়িয়াছে, তাহার বিবাহ এখনও দিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেজন্য সারদাবাবু গৃহিণীর নিকট নিত্য গঞ্জনা লাভ করেন।

ভবানীপুরে আসিয়া সারদাবাবু উৎসাহের সহিত আদিগঙ্গায় প্রাতঃস্নান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সূত্রে পাড়ার আর কয়েকজন গঙ্গাস্নানার্থী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহারাও সারদাবাবুর মতই নিষ্কর্ম্মা ও পরিণত-বয়স্ক। ক্রমে পরস্পরের গৃহে যাতায়াত এবং পরিণামে সারদাবাবুরই বৈঠকখানায় আড্ডা স্থাপন হইল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বন্ধুরা একে একে আসিয়া উপস্থিত হন। সারদাবাবু পশ্চিমে ছিলেন, টাকাও রোজগার করিয়াছেন বিস্তর, দিল্ ছিল দরিয়ার মত বিস্তৃত, আতিথ্য-বিষয়ে চিরদিন মুক্ত-হস্তই ছিলেন। এখানেও চা-চুরুট তামাক বিতরণে কার্পণ্য করা তাঁহার ধাতে সহিল না।

যে বন্ধুগুলি সংগ্রহ হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে একটীর প্রতি সারদাবাবুর মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। তাঁহার নাম ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। বয়স তাঁহার সারদাবাবুর চেয়ে দুই এক বৎসর বেশীই হইবে। তিনিও গভর্ণমেণ্টের পেন্সন-ভোগী। ঠিক পাড়ায় নয়, একটু দূরেই তাঁহার গৃহ। তথাপি এই আড্ডায় আসিয়া প্রায়ই তিনি হাজিরা দেন।

এখন, ইঁহার প্রতি সারদাবাবুর বিশেষ আকর্ষণের কারণটা খুলিয়া বলি। ভগবতীবাবুর একটী পুত্র আছে, বছর পঁচিশ ছাব্বিশ তার বয়স। তাহার নাম কুলদাচরণ, সেই ভগবতীবাবুর একমাত্র পুত্র। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে কুলদার বিবাহ হইয়াছিল, আজ এক বৎসর কাল সে বিপত্নীক। প্রথম সন্তান প্রসব করিবার কালেই কুলদার স্ত্রী মারা যান, একটী ছেলে হইয়াছিল; সেটী সাতদিন

মাত্র জীবিত ছিল। কুলদা আই-এ পাস করিয়া আপিসে ঢুকিয়াছিল, এখন পঁচাত্তর টাকা বেতন পায়। আপিসে তাহার উন্নতির আশা আছে, ছেলেটী দেখিতেও ভাল, তার উপর বেশ বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র। ভবানীপুরে আসিয়াও সারদাবাবু মেয়ের জন্ত পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন, সুবিধা মত অন্ত কোনও পাত্র যদি না-ই পাওয়া যায়, তবে কুলদার সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্তার বিবাহের সম্বন্ধ করিবেন, ইহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়।

কিন্তু ভগবতীবাবুর সাক্ষাতে এখনও এ কথা তিনি পাড়েন নাই। আরও ভাল পাত্র যদি পাই, এই আশায় কিছুদিন কাটাইলেন। কিন্তু তেমন মনের মত পাত্র জুটিতেছে না দেখিয়া, অবশেষে ভগবতীবাবুর কাছে তিনি কথাটা পাড়িলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ঘটনাক্রমে অন্ত কোনও বন্ধু সারদাবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন না। ভৃত্য আসিয়া দুই পেয়ালা চা দিয়া গেল। চা-পান করিতে করিতে সারদাবাবু ভগবতী-বাবুকে বলিলেন, "চাটুয্যে-মশাই, আপনার বৌমা তো প্রায় একবৎসর হ'ল গত হয়েছেন, ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন? আমার ছোট মেয়েটিকে আপনি দেখেছেন তো! মেয়ে বড় হয়েছে, সাজবেও ভাল আপনার ছেলের সঙ্গে। যদি মত করেন—"

ভগবতীবাবু বলিলেন, "মেয়ে ত আপনার খাসা মেয়ে। কিন্তু হলে হবে কি! ছেলের বিয়ে আমি কি ইচ্ছে ক'রে দিচ্ছিনে সারদাবাবু? ছেলে রাজি হয় কৈ?"

"কেন, রাজি হয় না কেন? কিই বা তার বয়স! ও-বয়সে কত লোকের তো প্রথম বিবাহই হয় না।"

ভগবতীবাবু বলিলেন, "তা সে বোঝে কৈ বলুন! আমার ধরুন ঐ একটী ছেলে। ও যদি আর বিয়ে না করে তা হ'লে তো বংশটাই লোপ হ'ল। কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এল, ও কিছুতেই রাজি হয় না। আমি কত বোঝালাম, ওর গর্ভধারিণী কত কান্নাকাটি করলেন, কিছুতেই কিছু হ'ল না। দেখে শুনে আমরা তো একরকম হালই ছেড়ে দিয়েছি মশাই। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! সবই অদৃষ্ট!"—বলিয়া ভগবতীবাবু চা-পান শেষ করিয়া পাণ মুখে দিলেন।

সারদাবাবু বলিলেন, "সে বউয়ের শোকটা বড্ড বেশী লেগেছে বোধ হয় ওকে।"

"তা লেগেছে বটে। বউমা যাওয়ার পর থেকে ও মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েছে, আতপান্ন ধরেছে, একবেলা মাত্র খায়,—বলে, আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেছি। ব্রহ্মচর্য্য কর্‌ছে, আর পদ্য লিখ্‌ছে।"

"পদ্য লেখে না কি?"

"হ্যাঁ, বউয়ের নামে রাশি রাশি পদ্য লিখেছে। কি রবিবারে, খেয়ে দেয়ে, খাতা পেন্সিল নিয়ে, ষ্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে শিবপুরে কোম্পানির বাগানে যায়, সেই খানে গাছতলায় ব'সে ব'সে না কি বউয়ের জন্যে কাঁদে, আর পদ্য লেখে। এ কথা তার বন্ধুদের মুখেই আমি শুনেছি।"

সারদাবাবু বলিলেন, "ও রকম তো কতই শোনা গেছে। ঐ রকম ব্রহ্মচর্য্য-টর্য্য বেশী দিন তো টেঁকে না,—শেষ কালে হয় নিজেই খুঁজে পেতে আবার বিয়ে করে, না হয় একটা কেলেঙ্কারি ক'রে বসে।"

উত্তরে নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন। অন্যান্য বন্ধুগণও একে একে আসিয়া সভাস্থ হইতে লাগিলেন।

২

উপরে বর্ণিত ঘটনার মাসখানেক পরে, এক রবিবারে কবি-ব্রহ্মচারী কুলদাচরণ, আহারাদি সারিয়া যথানিয়মে খাতা পেন্সিল লইয়া, শিবপুর যাত্রা করিল।

বৃক্ষতলে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, কবিতার খাতা খুলিয়া কুলদা কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত। আজ এক ঘণ্টার উপর এই ভাবে সে বসিয়া আছে, মোটে পাঁচটী লাইন লেখা হইয়াছে, ষষ্ঠ লাইনটী দুই তিন বার লিখিয়া, কাটিয়াছে, কিছুতেই আর মনের মত হইতেছে না, এমন সময় অদূরে কোনও রমণীর ক্রন্দনধ্বনি তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিল।

কুলদা চমকিয়া উঠিল। এখানে, এ সময়ে, কে স্ত্রীলোক কাঁদে? খাতা ও পেন্সিল পকেটে ভরিয়া সে চট্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে ছুটিল।

দুইটা মাত্র বৃক্ষের অন্তরাল পার হইয়া কুলদা দেখিল, বৃক্ষমূলে একটী বাঙ্গালীর মেয়ে বসিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। মুখখানি সে দেখিতে পাইল না, হাত দু'খানির রঙ বেশ ফর্সা, বস্ত্রাদি ভদ্রলোকের মেয়ের মতই। আকার দেখিয়া, মেয়েটী বালিকা না যুবতী তাহা কুলদা ঠিক ঠাহর করিতে পারিল না।

নিকটে গিয়া বলিল, "এখানে ব'সে আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন? কি হয়েছে আপনার?"

শুনিয়া মেয়েটী মুখ হইতে হস্তাচ্ছাদন খুলিয়া, একবার মাত্র আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল। আবার সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল; তাহার কান্নার বেগ বাড়িয়া গেল।

মেয়েটীর তরুণ-মুখখানি দেখিয়া কুলদা অনুমান করিল, ইহার বয়স বড় জোর তের চোদ্দ বছর, সুতরাং স্থির করিল, ইহাকে আপনি বলার কোনই প্রয়োজন নাই। আবার সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তুমি কাঁদছ বল না। তোমার কিছু ভয় নেই, কি হয়েছে বল। যদি তোমার কোনও উপকার আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তা নিশ্চয়ই আমি করবো।"

তবু মেয়েটী মুখও খোলে না, উত্তরও করে না। কুলদা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে, মেয়েটী অবশেষে কোঁপাইতে কোঁপাইতে বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমি হারিয়ে গেছি।"

কুলদার প্রশ্নের উত্তরে নিজের ইতিহাস মেয়েটী যাহা বলিল

তাহা এই। জন্মাবধি পিতামাতার সহিত সে পাঞ্জাবে ছিল, জলন্ধরে কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে পাঠ করিত। তাহার নাম কমলা। সম্প্রতি পিতার সহিত সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। আজ বেলা দশটার পর ট্রামে তাহার পিতা তাহাকে এই বাগান দেখাইতে আনিয়াছিলেন। বেড়াইয়া বেড়াইয়া তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা পায়; তাই পিতা তাহাকে এইখানে বসাইয়া, খাবার কিনিতে বাজারে গিয়াছেন। তিন ঘণ্টা অতীত হইয়াছে, এখনও তিনি ফিরিলেন না, নিশ্চয়ই তাঁহার কোন অভাবনীয় বিপৎপাত হইয়াছে।

কুলদা মনে মনে বলিল, "দেখ দেখি একবার আক্কেল লোকটার! মেড়োর দেশে থাকে কি না—কত আর বুদ্ধি হবে? এই সোমত্ত মেয়েটাকে এখানে একলা ফেলে বাজারে গেছেন, খাবার কিনতে! বাজার কি এখানে?"

মেয়েটী আবার কান্নার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া কুলদা বলিল, "তুমি কিছু ভয় কোরো না, নিশ্চয়ই তোমার বাবা আর বেশী দেরী করবেন না, এইবার ফিরবেন। চল বরঞ্চ আমরা ফটকের কাছে গিয়ে ব'সে থাকি। তিনি আসছেন দূর থেকেই আমরা দেখতে পাব। তিনিও বাগানে ঢুকতেই তোমায় দেখতে পাবেন। এস আমার সঙ্গে, কিছু ভয় নেই তোমার। তোমাকে তোমার বাবার হাতে জিম্মে ক'রে দিয়ে তার পর আমি যাব এখান থেকে।"

মেয়েটী কাঁদিতে কাঁদিতে কুলদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

যাইতে যাইতে বলিল, "সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা ক'রেও বাবার যদি দেখা না পাই, তা হ'লে কি হবে আমার ?"

কুলদা বলিল, "তোমার কোনও চিন্তা নেই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করেও যদি তাঁর দেখা না-পাওয়া যায়, তোমাকে ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব, তার পর তোমার বাবার সন্ধান করবো। জলন্ধরে তোমার মাকে চিঠি লিখবো, তোমার আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছেন চিঠি লিখবো।"

বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যা হইল, মেয়েটীর পিতা কিন্তু ফিরিল না। কুলদা তখন শেষ ষ্টীমারে তাহাকে কলিকাতায় আনিল, এবং বাড়ী আসিয়া তাহাকে নিজ জননীর নিকট সমর্পণ করিয়া সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে জানাইল।

জননী গোপনে একটু হাসিলেন।

৩

ভগবতীবাবু, হারাণো মেয়েটির পিতার খোঁজ করিবার ভার পুত্র কুলদার উপরেই দিয়াছেন। এক সপ্তাহ কাটিল, কিন্তু মেয়েটীর পিতার কোন সন্ধান কুলদা করিতে পারিল না।

কুলদা আপিসে গেলে, দ্বিপ্রহরে সারদাবাবু ও তাঁহার স্ত্রী প্রায়ই কমলাকে দেখিতে আসেন।

বলা বাহুল্য কমলা সারদাবাবুরই কন্যা। সারদাবাবু ও কুলদার পিতা উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া, কমলাকে শিখাইয়া পড়াইয়া

সেদিন শিবপুর বাগানে বসাইয়া অন্তরালে অবস্থান করিতে-ছিলেন।

আরও এক সপ্তাহ নিষ্ফলে কাটিয়া গেলে কুলদার মাতা বলিলেন, "কমলার বাপের কোনও খোঁজ যখন পাওয়াই গেল না, কি আর করা যাবে? হাজার হোক ব্রাহ্মণের মেয়ে ত, ফেল্‌তে ত পারবো না, এখানেই ও থাকুক। আমার তো মেয়ে নেই, ওর দ্বারাই আমার মেয়ের অভাব পূর্ণ হবে। পরে তখন একটি পাত্র দেখে-শুনে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে।"

কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে কমলা হিন্দী ও সংস্কৃত ভালই শিখিয়াছিল। বিদ্যালয়ে সংস্কৃত নাটকাভিনয়ে সে একটী মেডেল পর্য্যন্ত পাইয়া-ছিল। কিন্তু বাঙ্গলা সে ভালরূপ শিখিবার সুযোগ কখনও পায় নাই। জননীর অনুরোধে কুলদা তাহাকে বাঙ্গলা পড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। অন্য দিন আপিস থাকায় বেশী সময় কমলাকে সে দিতে পারে না, রবিবারে বেশীক্ষণ পড়াইয়া পোষাইয়া লয়। শিবপুরের বাগানে যাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে।

শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতাও স্থাপিত হইয়াছে বেশ দেখা গেল। আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া ছাত্রীকে না দেখিলে, কুলদার পিপাসিত-চক্ষু চারিদিকে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। আর, কমলার রান্না পাঞ্জাবী ব্যঞ্জনগুলি তাহার মুখে লাগে যেন অমৃত!

মাস খানেক পরে কুলদার জননী একদিন কথায় কথায় তাহাকে বলিলেন, "উনি কমলার একটী সম্বন্ধ স্থির করছেন।

বরের বয়স কিছু বেশী হয়েছে—তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করবে, টাকা-কড়ি বিশেষ কিছু লাগবে না।”—বলা বাহুল্য ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

এই কাল্পনিক সংবাদ শ্রবণমাত্র কুলদার বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল। চোখে জল আসিল। জননীকে জানাইল, অমন সুন্দরী ভাল মেয়েকে ও-রকম পাত্রের হাতে কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। তার চেয়ে না-হয় অগত্যা নিজেই সে উহাকে বিবাহ করিবে।

উত্তম কথা। দিনস্থির হইল।

বিবাহের মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে কমলার পিতারও সন্ধান পাওয়া গেল। কুলদা ভাবিল, আশ্চর্য্য কথা! তিনি এই ভবানীপুরেই বাস করিতেছিলেন! এবং এ বাড়ী হইতে অধিক দূরেও নহে। জলন্ধর হইতে তাঁহার স্ত্রীও নাকি আসিয়াছেন।

কমলাকে সারদাবাবু স্বগৃহে লইয়া গেলেন। যথা দিনে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইল।

কুলদা এখন আর আতপান্ন খায় না, সিদ্ধ চাউলই খ হইতেছে, মাছ মাংসও ধরিয়াছে এবং দুই বেলাই উত্তমরূপে ভোজন করে। শিবপুরের বাগানে যাওয়া এবং “পদ্য” লেখা ত পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল।

সুশোভনা

১

শরৎকাল, পূজার ছুটীতে সহরের আফিস আদালত সবেমাত্র বন্ধ হইয়াছে। সে দিন বেলা ৯টার সময় রাইনগর ষ্টেশনে, কলিকাতা হইতে আগত ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা হইতে গুলী, বন্দুক প্রভৃতি শিকারের সরঞ্জামসহ দুইজন বাঙ্গালী যুবক অবতরণ করিল। একজনের অঙ্গে ইংরাজি ধরণের শিকারীর বেশ—বয়স আন্দাজ পঁচিশ হইবে। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, রঙটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নাম অমরেন্দ্রনাথ মল্লিক। অপর যুবকটি বয়সে ইহার অপেক্ষা দুই এক বৎসরের ছোট, হাতে বন্দুক থাকিলেও, পরিধানে ধুতি ও কোট। ইহার রঙটি অপেক্ষাকৃত ফরসা, দেহ-গঠনেও পারিপাট্য আছে—বিশেষ করিয়া তাহার চুলগুলি ও চোখ দু'টি বড় সুন্দর। ইহার নাম সুকুমার মজুমদার। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরা হইতে খানসামার উর্দ্দি-পরা এক মুসলমান ভৃত্য নামিল। তাহার সঙ্গে নামিল আমকাঠের এক সিন্দুক এবং একটা বড় বালতী। ঐ বালতীর ভিতর একটা বিলাতী চুলা (ষ্টোভ) ও অন্যান্য জিনিষ ভর্ত্তি ছিল। যুবকদ্বয় ধীরপদে অগ্রসর হইয়া ষ্টেশনের ওয়েটিং-

রুমে গিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়াছে। কুলীর মাথায় আমকাঠের সিন্দুক ও হাতে বালতী দিয়া খানসামাও আসিয়া ওয়েটিং-রুমে প্রবেশ করিল এবং কুলীকে পশ্চাতের বারান্দায় লইয়া গিয়া জিনিষপত্র নামাইয়া, ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

বখশিস লইয়া কুলীটা প্রস্থান করিতেছিল, অমরেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কি রে, তোর নাম কি ?"

"আজ্ঞে, আমার নাম হরিদাস, আমরা কৈবর্ত্ত।"

"এইখানেই বাড়ী ?"

"আজ্ঞে না, এখান থেকে কোশ-তিনেক হবে।"

"আচ্ছা, কুমীরদীঘি কোথায় জানিস্ ?"

"তা আর জানি নে হুজুর ? আমাদের গাঁ থেকে কোশ-খানেক পথ বৈ ত নয় !"

"এখান থেকে কত দূর, সেই দীঘি ?"

"এখান থেকে কোশ-দুই-আড়াই হবে।"

"কুমীরদীঘিতে কি সত্যি সত্যি কুমীর আছে ?"

"আজ্ঞে ছিল, খুবই ছিল। কল্‌কাতা থেকে সাহেবরা এসে মেরে মেরে তাদের বংশনাশ ক'রে দিয়েছে। তবে এখনও কুমীর যে একেবারে নেই, তা বল্‌তে পারলাম না, হুজুর !"

অমরেন্দ্র ইংরাজিতে সুকুমারকে বলিল, "আমাদের বন্দুক-টন্দুক, টিফিন-বাক্স বইবার জন্তে একটা লোক ত দরকার, একেই নিযুক্ত করা যাক্ না।"

সুকুমার বলিল, "সেই ভাল। সেই যায়গারই লোক, চেনে শোনে।"

অমরেন্দ্র হরিদাসের মজুরী স্থির করিয়া, সারাদিনের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করিল। হরিদাস বলিল, "কখন্ বেরুতে হবে, হুজুর?"

"এই, আধ ঘণ্টা পরেই।"

"আজ্ঞে হুজুর, তবে আমি বাসা থেকে ঘুরে আসি।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

চায়ের জল তৈয়ারি হইলে, খানসামা টেবিল "লাগাইয়া" টিফিন-বাক্স হইতে লুচি, আলুভাজা, বেগুনভাজা, ফুলকপি-ভাজা ইত্যাদি বাহির করিয়া মনিব ও তাঁহার বন্ধুকে "ব্রেকফাষ্ট" খাওয়াইল। জলের পরিবর্ত্তে চা দিল।

ব্রেকফাষ্ট খাইতে খাইতে অমরেন্দ্র দেখিল, কয়েকজন লোক দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া, হাঁ করিয়া তামাসা দেখিতেছে। অমরেন্দ্র খানসামাকে বলিল, "পর্দ্দাটা টেনে দে।" খানসামা ছুটিয়া গিয়া, তাহাদিগকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া, দ্বারের পর্দ্দা টানিয়া দিল।

প্রাতরাশ সমাধা করিয়া দুই বন্ধু সিগারেট সেবন করিতেছিল, হরিদাস আসিয়া পৌঁছিল।

অমরেন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে, মুর্গী পাওয়া যায় এখানে?"

হরিদাস অঙ্গুলিনির্দ্দেশে মুক্ত বাতায়ন-পথে দেখাইল, "হুজুর,

ঐ যে দেখছেন মাঠের পারে আমগাছগুলো, ঐখানে মোমিনপুর গেরাম। ওখানে অনেক চাষী মুসলমানের বাস। তাদের কাছে তালাস করলে মুর্গী, এণ্ডা সবই পাওয়া যাবে।”

অমরেন্দ্র নিজ ভৃত্যকে বলিল, “আমরা বেরিয়ে গেলেই ঐ মোমিনপুরে গিয়ে গোটা দু'চ্চার মুর্গী আর ডজন-খানেক ডিম কিনে আন্‌বি। রাত্রের জন্যে একটা মুর্গীর রোষ্ট আর একটা মুর্গীর কারি বানিয়ে রাখ্‌বি। আমরা ফিরে এলে, তার পর ভাত বানাবি—বুঝ্‌লি ?”

খানসামা বলিল, “জী হুজুর।”

বিধাতাপুরুষ কিন্তু অদৃশ্যে থাকিয়া এই ভোজনের আয়োজন শুনিয়া হাসিলেন,—কারণ, এখন কিছুকাল এই দুই যুবকের অন্ন তিনি স্থানান্তরে “মাপাইয়া” রাখিয়াছিলেন।

খানসামা, প্রভুর আদেশ অনুসারে, তাহার আমকাঠের সিন্দুক হইতে, বরফজল-পরিপূর্ণ দুইটি বড় বড় থার্ম্মোফ্লাস্ক বাহির করিয়া, টিফিন-বাক্স সাজাইতে বসিল। হরিদাস সন্দিগ্ধনেত্রে টিফিন-বাক্সের পানে চাহিয়া বলিল, “হুজুর, এই বাক্সে রান্না মুর্গী-টুর্গীও যাচ্ছে না কি ?” অমরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, “না রে না। ঐ দেখ্‌ না, কচুরি, সিঙ্গাড়া, সন্দেশ-টন্দেশ ছাড়া আর কিছু নেই। ও কচুরি-সিঙ্গাড়াও আমার বাড়ীর বামুন-ঠাকুরের ভাজা। তোর কোনও ভয় নেই।”

টিফিন-বাক্স, বন্দুকের বাক্স প্রভৃতি হরিদাসের মাথায় চাপাইয়া দুই বন্ধু শিকারে যাত্রা করিল। উভয়েই হিন্দুর ছেলে, “দুর্গা

শ্রীহরি" বলিয়া যাত্রা করাই উচিত ছিল, কিন্তু কলির প্রাবল্যে সে কথা তাহাদের স্মরণ ছিল না।

২

এইখানে এই যুবকদ্বয়ের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান আবশ্যক। কলিকাতা বাদুড়বাগানে উভয়েরই বাস, উভয়েই বৈদ্যবংশসম্ভূত। অমরেন্দ্রনাথ "মুখে রূপার চামচ" লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—তার পিতা অত্যন্ত ধনী ছিলেন, কলিকাতায় তাঁহার বিস্তৃত কারবার। নিজ বসত-বাটী ছাড়া এখানে ওখানে তাঁহার পাঁচখানি বাড়ী ভাড়া খাটে। তিনি এখন স্বর্গগত, তাঁহার একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্রনাথই তাঁহার পরিত্যক্ত ব্যবসায় ও তাবৎ ভূসম্পত্তির মালিক। তিন বৎসর পূর্ব্বে অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল, গত বৎসর তাহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। স্ত্রী সুভাষিণী রূপে-গুণে অমরেন্দ্রনাথের মনোমত সহধর্ম্মিণী, তাহার সহিত অমরেন্দ্রনাথের প্রণয় এখনও উদ্দাম। অমরেন্দ্রনাথের জননী সধবা অবস্থাতেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী ছাড়া, গৃহে তাহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে, তার নাম সান্ত্বনা, এবং এক বৃদ্ধা জ্যেঠাইমা আছেন, তিনি বধূর হাতে সংসারের ভার তুলিয়া দিয়া এখন হরিনাম জপ, এবং লোকজনকে তর্জ্জন-গর্জ্জন ও এ-কালের সর্ব্ববিষয়ের নিন্দা করিয়া কাল-যাপন করেন।

অপর যুবক সুকুমার মজুমদার দরিদ্রের সন্তান। তার পিতা অল্পবেতনে কেরাণীগিরি করিতেন, দুইটি কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সুকুমারও কেরাণীগিরি করিয়া জীবন-যাপন করিতেছে। গৃহে বিধবা জননী ছাড়া দুইটি ছোট ভাই এবং একটি অবিবাহিতা ভগিনীও বর্ত্তমান।

সাংসারিক অবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও, অমরেন্দ্র ও সুকুমারের মধ্যে বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্ব অত্যন্ত নিবিড়। বিদ্যালয়ে তাহারা একই শ্রেণীতে পড়িত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অমরেন্দ্র পড়া ছাড়িয়া, পিতার হউসে প্রবেশ করে। সুকুমার বি-এ পাস করিয়া এম-এ পড়িতেছিল, এমন সময় তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল, কাযেই উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়া তাহাকে পড়া ছাড়িতে হইল। বাপের আফিসের বড় সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে চাকরী দিলেন ;—সেই চাকরীই সে করিতেছে।

আর একটি কথা বলিলেই ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ হয়। অমরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যভাবে স্থির করিয়াছে, তাহার ভগিনী সান্ত্বনার সহিত সুকুমারের বিবাহ দিয়া নিজেদের বন্ধুত্ব পাকা করিয়া লইবে, এবং তাহার মনের গোপন অভিপ্রায়, বিবাহান্তে সুকুমারকে তার অল্পবেতনের কেরাণীগিরি ছাড়াইয়া নিজ ব্যবসায়ে শূন্য অংশীদার করিয়া লইবে। কিন্তু সান্ত্বনা অগ্রজের মনের এই গোপন অভিপ্রায় অবগত ছিল না। এখন সে আর নিতান্ত ক্ষুদ্র বালিকা নহে, তাহার বয়স হইয়াছে চতুর্দ্দশ বর্ষ। এ বিবাহের প্রস্তাব হওয়া অবধি সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আছে। সুকুমারদের

দেখ দিদিমণি, অন্য লোক ছু'টো স'রে গেল, সায়েবটা শুয়ে পড়লো।"

সুশোভনা বলিল, "বোধ হয়, কোনও কুমীরে গা ভাসান দিয়েছে, গুলী করবে।"—বলিয়া যন্ত্রটি চাহিয়া লইয়া সে নিজ চক্ষুতে লাগাইল।

তাহার অনুমানই সত্য হইল। ধোঁয়া দেখা গেল, দুই তিন সেকেণ্ড পরেই বন্দুকের আওয়াজও কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল।

সুশোভনা দেখিল, শিকারী উঠিয়া দাঁড়াইল, যে লোক দুই জন পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছিল, তাহারাও ছুটিয়া আসিল। তিন জনেই একত্র উচ্চ পাড় হইতে নামিতে লাগিল, এবং হঠাৎ শিকারী পদস্খলিত হইয়া, গড়াইতে গড়াইতে জলের কাছে গিয়া স্থির হইল।

সুশোভনা দূরবীণ নামাইয়া বলিয়া উঠিল, "যাঃ, প'ড়ে গেল।"

"কে দিদিমণি ?"

"ঐ শিকারী।"

"দূরবীণটে দাও না দিদিমণি, দেখি।"

"দাঁড়া!"—বলিয়া সুশোভনা দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, অপর লোক দুই জন সাবধানে পাড় হইতে নামিয়া সেই শিকারীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শিকারীর নিকট তারা ঝুঁকিয়া বসিল। একজন দীঘি হইতে জল আনিয়া শিকারীর মুখে-চোখে সেচন

করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে, ভূপতিত ব্যক্তি উঠিয়া বসিল, তার পর আবার সে শুইয়া পড়িল।

সুশোভনা বলিল, "আহা, বড্ড বোধ হয় জখম হয়েছে!" বলিয়াই তাহার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। আহা, এই জনশূন্য তেপান্তর মাঠে, এই বিপদে, উহাদের কি হইবে? বাইনকুলার ঝির হাতে দিয়া, সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গিয়া ডাকিল—"বাবা।"

হরিশঙ্করবাবুর একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি মা?"

সুশোভনা বলিল, "বাবা, কুমীরদীঘিতে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক শিকার করতে এসে, পা'ড় থেকে নীচে প'ড়ে ভয়ানক আঘাত পেয়েছেন। এই তেপান্তর মাঠের মধ্যে তাঁর কি উপায় হবে, বাবা?"

হরিশঙ্করবাবু চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কে বল্লে তোমায়?"

"আমি ছাদ থেকে বাইনকুলার দিয়ে দেখছিলাম বাবা। তাঁকে প'ড়ে যেতে দেখলাম। অজ্ঞান হয়ে গেছেন বোধ হ'ল।"

"কতক্ষণ?"

"এখনও পাঁচ মিনিট হয় নি বোধ হয়। বাবা, পাল্কী-বেয়ারা ছুটিয়ে দিন, তাঁকে নিয়ে আসুক এখানে। নইলে আর ত কোনও উপায় নেই।"

হরিশঙ্করবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি নিজেই তা হ'লে পাল্কী নিয়ে যাই। তুমি ততক্ষণ

এক কায কর, মা। তাকে এনে উপরে তোলা বোধ হয় চলবে না। নীচের ঘরে যে লোহার খাটখানা আছে, তারই উপর ততক্ষণ বিছানা ক'রে রাখ। আমার জামাটা জুতোটা দাও।"

সুশোভনা ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া পিতার জামা ও জুতা লইয়া আসিল। হরিশঙ্করবাবু উহা পরিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। পাল্কীবাহকগণ বাড়ীতেই থাকিত—তাহারা তখন আহারান্তে দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। পাল্কীতে বিছানা বিছাইয়া হরিশঙ্করবাবু স্বয়ং উহাতে আরোহণ করিয়া কুমীরদীঘি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুশোভনা ছাদে গিয়া ঝির হাত হইতে বাইনকুলার লইয়া, চোখে লাগাইয়া দেখিল, শিকারীর সঙ্গে যে দুই জন লোক ছিল, তাহাদের একজন কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে,—অপর জন আহতের শুশ্রূষায় নিযুক্ত। তার পর ঝিকে বলিল, "কিশোরীর-মা, বাবা রোগীকে আনতে পাল্কী নিয়ে নিজে গেছেন। নীচের ঘরে যে লোহার খাটখানা আছে, তাতে গদি পাতাই আছে, গদিটার ধূলো বেশ ক'রে ঝেড়ে, তার উপর একখানা তোষক আর একটা সাফ চাদর পেতে, বালিস-টালিস দিয়ে বিছানা পেতে রাখ্ গে—বাবা ব'লে গেছেন।"

"ও মা, কি আপদ হ'ল! হে মা মধুসূদন!"—বলিয়া ঝি প্রস্থান করিল।

সুশোভনা দেখিতে লাগিল। ঐ তাহার পিতার পাল্কী ছুটিয়াছে। এক মিনিট, দুই মিনিট, প্রায় মাঝামাঝি গিয়া

পৌঁছিল। হঠাৎ একটা কথা তাহার স্মরণ হইল। সে নীচে নামিয়া গেল। কিশোরীর-মা তোষক ও বিছানার চাদর অন্বেষণে-ব্যাপৃত। সুশোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "কিশোরীর-মা, তুই চূণে-হলুদ তৈরি করতে জানিস্?"

"হ্যাঁ দিদিমণি, তা আর জানি নে?"

"তবে যা, তুই হলুদ বেঁটে একটা এনামেলের বাটিতে চূণ আর হলুদ মিশিয়ে ষ্টোভ জেলে চড়িয়ে দিগে যা, বিছানা-টিছানা আমিই সব ঠিক ক'রে রাখছি।"

কিশোরীর-মা চলিয়া গেল। তোষক প্রভৃতি লইয়া সুশোভনা শয্যা প্রস্তুত করিয়া, আবার ছাদে গিয়া উঠিল। যত্নে চক্ষুলগ্ন করিয়া দেখিল, পাল্কী ফিরিতেছে—তাহার পিতা ও অপর ভদ্রলোকটি পদব্রজে আসিতেছেন। পাল্কী দ্রুত আসিতেছে।

তাই ত, রোগী আসিয়া পৌঁছিবে, পিতা পশ্চাতে রহিলেন যে! সুশোভনা আবার নামিয়া গেল। সরকারবাবুকে ডাকিয়া তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিল। সরকারবাবু ফটকের নিকট গিয়া দ্বারবান্ ও মালীকে ডাকিয়া, রোগীকে নামাইয়া বিছানায় লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ দিতে লাগিলেন। বামুন-ঠাকুর ও রামকিষণ ভৃত্যও সাহায্য করিবে। সুশোভনা বারান্দায় উঠিয়া পথপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল। পাল্কী বারান্দার উপরে উঠানো হইল। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া রোগীকে নামাইয়া শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া দিল। রোগী যন্ত্রণায়

কাৎরাইতে কাৎরাইতে, একবার চক্ষু খুলিয়া সুশোভনার প্রতি চাহিল। বলিল, "টেলিগ্রাম ক'রে কলকাতা থেকে ডাক্তার আনান্—বড় যন্ত্রণা।"

সুশোভনা বলিল, "তাই আনাচ্ছি। বাবা আসুন। আপনার কোন্‌খানে বেশী লেগেছে, বলুন দেখি!"

রোগী কাৎরাইতে কাৎরাইতে বাম পদে হাঁটুর নিম্নস্থান দেখাইয়া বলিল, "বোধ হয়, ফ্র্যাকচর হয়েছে।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই হরিশঙ্করবাবু রোগীর বন্ধু সুকুমারের সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিলেন। চুণে-হলুদ প্রস্তুত আনিয়া তিনি জখমের স্থানে উহা লাগাইয়া ফ্ল্যানেল জড়াইয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হইল, তাহার কাৎরানি বন্ধ হইল, নিদ্রার আবেশ দেখা দিল।

হরিশঙ্করবাবু তখন কক্ষান্তরে গিয়া সুকুমারের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। সুকুমার বলিল, "আমি যাই, কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে আসি।"

হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "সন্ধ্যার আগে কলকাতায় যাবার ট্রেণ ত নেই—তাতে অনেক সময় নষ্ট হবে যে! বরঞ্চ অমরবাবুর ফার্ম্মের ম্যানেজার—কি নাম বল্লেন যে—তাঁকে টেলিগ্রাম ক'রে দিন, তিনি মেডিকেল কলেজের কোন ভাল সার্জ্জনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। এখন বেলা দেড়টা—সন্ধ্যা নাগাদ তিনি ডাক্তার নিয়ে এসে পড়তে পারবেন।"

তদনুসারে রোগীর অবস্থার সব কথা খুলিয়া একখানি দীর্ঘ টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল।

রোগী জাগিলে, মাঝে মাঝে তাহাকে গরম দুধ পান করানো হইল।

বেলা পাঁচটার সময় তার আসিয়া পৌঁছিল, ম্যানেজারবাবু সাহেব ডাক্তারসহ সন্ধ্যা আটটার ট্রেণে আসিয়া পৌঁছিবেন, অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ভগিনী ঐ সঙ্গে আসিতেছেন; ষ্টেশনে যান-বাহনের যেন ব্যবস্থা থাকে।

হরিশঙ্করবাবু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার সরকারকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। সুকুমার বলিল, "সরকার-মশাই, অমরেন্দ্রবাবুর একজন বাবুর্চ্চি এসেছিল আমাদের সঙ্গে, ওয়েটিং-রুমে বারান্দায় তাকে দেখতে পাবেন, তাকে একখানা টিকিট কিনে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে বলবেন, এই টাকা নিন।"

রাত্রি নয়টার মধ্যেই সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন।

ডাক্তার সাহেব অমরেন্দ্রনাথের ভাঙ্গা হাড় "সেট" করিয়া মজবুতরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া, এক্সটেন্সন প্রোসেসে লোহার শিকের কর্ম্মায় উহা আটকাইয়া, সেই কর্ম্মা পালঙ্কের ছত্রীতে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। ভাঙ্গা পা বিছানা হইতে চার-পাঁচ ইঞ্চি উর্দ্ধে, বদ্ধ অবস্থায় দোদুল্যমান। বলিলেন, পূরা তিন সপ্তাহকাল, যত দিন ভাঙ্গা হাড় না যোড়া লাগিবে, ততদিন রোগীকে এই অবস্থাতেই থাকিতে হইবে। সে শুইয়া থাকিবে, যদি যন্ত্রণাবোধ

না হয়, তবে একটু উঠিয়া বসিতেও পারে। কিন্তু শয্যাত্যাগ করিতে পারিবে না।

ডাক্তার সাহেব সপ্তাহে একবার করিয়া আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইবেন স্থির হইল।

অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ভগিনী উভয়েই এখানে রহিয়া গেলেন। সুকুমারও রহিল। হরিশঙ্করবাবু ও তাঁহার কন্যার যত্ন ও সৌজন্যে সকলেই আপ্যায়িত।

৪

এক মাস কাটিয়া গিয়াছে—এখনও অমরেন্দ্রনাথের বন্ধাবস্থা। প্রথমে ডাক্তার সাহেব তিন সপ্তাহের কথা বলিলেও, গত সপ্তাহে তিনি রোগীর ভাঙ্গা পায়ের এক্স-রে ফটো তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এ সপ্তাহে সেই ছবি আনিলেন এবং সকলকে উহা দেখাইলেন যে, হাড় বেমালুমভাবে যোড়া লাগিয়া গিয়াছে। বলিলেন, তথাপি নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য আরও দুই সপ্তাহ রোগীর বাঁধন খুলিবেন না। বাঁধন খুলিলেও রোগী বাড়ী যাইতে পাইবে না, এক সপ্তাহ বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া পায়ে মালিস করাইতে হইবে, কারণ, এই দীর্ঘকালের অ-সঞ্চালনে পা অসাড় হইয়া গিয়াছে, আরও যাইবে।

অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুভাষিণী ও ভগিনী সান্ত্বনা দুজনেই এখানে। প্রথম চারি পাঁচ দিনের পর যখন দেখা গেল যে,

রোগীর কোনও প্রকার দৈহিক যন্ত্রণা আর নাই, অধিক শুশ্রূষারও আবশ্যক হয় না, তখন ইঁহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, সান্ত্বনাকে লইয়া সুভাষিণী ফিরিয়া যাউন, গৃহস্থের যথেষ্ট আশ্রমপীড়া ঘটানো হইতেছে, তাহার যতটুকু লাঘব করা যায়। সুকুমারের আপিস খুলিলে একদিনমাত্র গিয়া সে এক মাসের ছুটী লইয়া আসিয়া এখানে থাকুক। কিন্তু হরিশঙ্করবাবু কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজি হন নাই—বিনীতভাবে উত্থাপিত আশ্রমপীড়ার কথা তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "আমরা এতগুলি লোক যদি দু'বেলা দু'মুটো খেতে পাই, তবে তোমাদেরও দু'মুটো খাওয়াতে আমার কষ্ট হবে না। এই সঙ্কটের দিনে স্ত্রী, ভগিনী কাছে থাকলে, আর কিছু না হোক, মনটাও ভাল থাকবে, তাই কি কম লাভ? না না, ও সব ছেলেমানুষী খেয়াল তোমরা ছেড়ে দাও।"

ও দিকে আবার এক বিষম বিভ্রাট বাধিয়া গিয়াছে। সুভাষিণী, সান্ত্বনা রোগীর পরিচর্য্যার জন্য রহিয়া গেল, সুকুমারের থাকিবার বিশেষ কিছু আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু সে-ও আছে। আপিস খুলিবার দিন আপিসে গিয়া সে দুই সপ্তাহের ছুটী লইয়া আসিয়াছে—এবং তাহার থাকিবার কারণ যে নিছক বন্ধুপ্রীতি, এ কথাও জোর করিয়া বলা চলে না। আসল কথা এই যে, এ বাড়ীর মেয়ে সুশোভনাকে তাহার বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। সান্ত্বনা, সুভাষিণী প্রায় সারাদিনই রোগীর নিকট থাকে, সুকুমার আসিলে সুভাষিণী একটু সঙ্কুচিতা হয়, সান্ত্বনা "মুখ হাঁড়ি" করে,

—সুতরাং রোগীর পার্শ্বে বসিয়া থাকার তাহার প্রয়োজনও হয় না এবং উহা প্রীতিকরও নয়। সুতরাং সে প্রায় সারাদিন সুশোভনার আশে-পাশেই থাকে এবং এটাও সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সুশোভনা তাহাতে বিরক্ত ত নয়ই, বরং তাহার উল্টা। সুশোভনা ও সান্ত্বনাকে যখনই সে একত্র দেখে, তখনই তাহার মনের কম্পাস-কাঁটা সান্ত্বনার প্রতি বিমুখ হইয়া, সুশোভনার প্রতি বেগে ধাবিত হয়। মেয়েরা স্নান করিতে গেলে, সুকুমার আসিয়া বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে বসে। বন্ধুকে সব কথাই সে বলিয়াছে।

কবে এবং কি অবস্থায় ইহাদের দু'জনের মন জানাজানি হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু সুশোভনার কলেজ খুলিবার দুই দিন পূর্ব্বে, অপরাহ্নে বাগানের আমগাছের ছায়ায় লোহার বেঞ্চে বসিয়া দুই জনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

সুকুমার। পর্শু ত তোমার কলেজ খুলছে, তুমি ত চল্লে!

সুশোভনা। হ্যাঁ, যেতেই ত হবে। ঐ দিন তোমারও ত ছুটী ফুরোবে?

সুকু। হ্যাঁ, আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু তার আগে, বাবার কাছে আমি কথাটা পাড়তে চাই, তুমি কি বল?

সুশো। আমি আর কি বলবো? বাবা শুনে যে কি বলবেন, তাই ভেবেই আমার গা কাঁপছে।

সুকু। আমি অবশ্য তাঁকে বল্‌বো যে আমার সাংসারিক অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ জেনে শুনেই তুমি আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছ। তা' হলেও কি তিনি অমত কর্‌বেন?

সুশো। কি জানি, হয়ত বলবেন, ও ছেলেমানুষ, ও নিজের ভাল-মন্দের কি বোঝে, ওর কথা ধর্ত্তব্যই নয়।

সুকু। তিনি যদি বোঝেন যে, আমাদের এই মিলনে বাধা দিলে দু'টো বুক ভেঙ্গে যাবে—আমার যাক্ না হয়, তাতে তাঁর কি আসে যায়?—তোমার বুকও ভেঙ্গে যাবে—তা হ'লে কি তিনি মত না দিয়ে থাকৃতে পারবেন? মা যদি বেঁচে থাকতেন এ সময়, তা হ'লে বোধ হয়, আমাদের এত ভাবতে হ'ত না।

সুশো। বাবা যে মা'র চেয়ে আমায় কম ভালবাসেন, তা নয়। কিন্তু তবু ভয় যে ঘোচে না!

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর সুকুমার বলিল, "আচ্ছা, কলকাতায় কি তোমাতে আমাতে দেখা-সাক্ষাৎ সম্ভব হবে না?"

সুশো। তা কি রকম ক'রে হবে?

সুকু। বোর্ডিং-এ ত মেয়েদের আত্মীয়-বন্ধুরা গিয়ে দেখা করতে পারে, সপ্তাহে একদিন না মাসে একদিন, কি একটা নিয়ম আছে, শুনেছি।

সুশো। হ্যাঁ, সে বাপ-মা। অন্ত কেউ দেখা করতে চাইলে, বাপের চিঠি চাই।

সুকু। আচ্ছা, বাবা যদি রাজি হন, তা হ'লে তিনি কি আমাকে ঐ রকম চিঠি দেবেন না?

সুশো। কি জানি। কিন্তু বাবা অনুমতি দিলেও, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে মহা মুস্কিল হবে যে।

সুকু। কেন ?

সুশো। অন্ত মেয়েরা সবাই আমায় জিজ্ঞাসা করবে, ও তোর কে ? তুমি যে আমার কে, এবং কি, তা ত আমি প্রকাশ করতে পারবো না ! তা হ'লেই তারা বুঝে নেবে—তারি কাছু মেয়ে সব। তখন ঠাট্টা ক'রে তারা আমায় দেশছাড়া করবে যে। কিন্তু তার দরকারই বা কি ? সে শুভযোগই যদি আসে, বাবা যদি সম্মতই হন, তা হ'লে পরীক্ষা পর্য্যন্ত এ ক'টা মাস কি আমরা ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে পারবো না ?

এই সময় দেখা গেল, রামকিষণ ভৃত্য এই দিকে আসিতেছে, সুতরাং ইহারা কথাবার্ত্তা স্থগিত রাখিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের চা কি এইখানে পাঠানো হবে, না আপনারা টেবিলে যাবেন ?"

সুকুমার সুশোভনার প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এইখানেই আসুক না।" কিন্তু সুশোভনা বলিল, "না, আমরা বাড়ীতেই যাই চল। রামকিষণ, বাবাকে বল গে, আমরা আসছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে সুশোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার সঙ্গে ও-কথা কখন্ কইবে তুমি ?"

""রাত্রে, খাওয়ার পর। তুমি কি বল ?"

"বেশ।"

৮

রাত্রিতে আহারের পর, সুশোভনা সুভাষিণীর সহিত দেখা করিতে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল, সুকুমার হরিশঙ্করবাবুর সহিত উপরে চলিয়া গেল।

হরিশঙ্করবাবু বারান্দায় ইজি-চেয়ারে উপবেশন করিলেন। রামকিষুণ তামাক দিয়া গেল। হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "সুকুমার, তোমায় কবে আপিসে জয়েন করতে হবে?"

"পর্শু। কালই আমি কলকাতায় ফিরবো ভাবছি।"

"কোন্ ট্রেণে?"

"বিকেলের ট্রেণে।"

"আমিও ত ঐ ট্রেণেই শোভনাকে কলেজে রাখতে যাব।"

"ভালই হ'ল, তা হ'লে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।" বলিয়া সুকুমার নীরব হইল। হরিশঙ্করবাবুও নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

প্রায় এক মিনিটকাল অপেক্ষা করিবার পর সুকুমার হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হরিশঙ্কর বাবু, আজ আমি একটা বিশেষ কথা আপনাকে বলবার জন্তেই অপেক্ষা করছি।"

হরিশঙ্করবাবুর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল, কিন্তু অন্ধকারে সুকুমার উহা দেখিতে পাইল না। তিনি শান্তস্বরে বলিলেন, "কি বলবে, বল।"

সুকুমার তখন তাহার আবেদন জানাইল। নিজ দারিদ্র্যের কথাও অপকটে প্রকাশ করিল। সুশোভনা যে উহা জানিয়া শুনিয়াই তাহার সহধর্ম্মিণী হইতে সম্মত, সে কথাও বলিতে সে ক্রটি করিল না।

সুকুমারের কথা শেষ হইলে, হরিশঙ্করবাবু কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। সুকুমারের বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল,— খুনী আসামী যেন জজ সাহেবের রায় শুনিতে আসিয়াছে।

অবশেষে হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, সুকুমার, তোমরা ত পাকা হিন্দু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ বিলেত-টিলেত গিয়েছিলেন?"

"আজ্ঞে না।"

"তোমার মা বেঁচে আছেন বলেছিলে না?"

"হ্যাঁ।"

হরিশঙ্করবাবু আবার মৌনভাব ধারণ করিলেন। সুকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তাঁহার এ সব প্রশ্নের অর্থ কি?

শেষে হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "দেখ, তুমি তোমার সাংসারিক অবস্থার কথা যা বল্লে, সেটা আমার পক্ষে কোনও বাধা নয় মেয়ের বিয়ের সময় জামাইকে আমি যে যৌতুক দেবো, তাতে অনেক বছর তাদের জীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারবে আমার ঐ একমাত্র মেয়ে। আমার অবর্ত্তমানে সমস্তই আমা মেয়ে-জামাইয়ের হবে। তবে আর একটু বাধা আছে—ে বিষয়ে আজ রাতটা আমায় বিবেচনা করতে সময় দাও—আ কা'ল সকালে তোমার কথার উত্তর দেবো।"

পরদিন বেলা আটটার সময় সুকুমার যখন হরিশঙ্করবাবুর শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইল, তখন তাহার মুখখানি উল্লসিত।

নীচে নামিবার সিঁড়ির কাছে সুশোভনা দাঁড়াইয়াছিল, কোন ভৃত্যাদি তখন সেখানে নাই। সুশোভনা অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বল্লেন ?"

সুকুমার সুশোভনাকে বক্ষে জড়াইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিল, "আসছি, এসে বলবো।"—বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে নিম্নে অবতরণ করিল। সুশোভনাও হাসি-মুখে নিজ কার্য্যে গেল।

সুকুমার রোগীর কক্ষে গিয়া দেখিল, অমরেন্দ্র একা। জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরা কোথায় ?"

অমরেন্দ্র বলিল, "স্নানের ঘরে।"

"ভালই হ'ল।"—বলিয়া সুকুমার শয্যাপার্শ্বস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া বন্ধুর হাতখানি ধরিয়া বলিল, "ভাই, আমি তোমার বোন্‌কে বিয়ে করতে পারবো না বলেছিলাম, তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলে, নয় ?"

"সেটা ত খুব স্বাভাবিক।"

"না ভাই, তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না, আমার উপর রাগ কোরো না, তোমার বোন্‌কেই আমি বিয়ে করবো।"

"কেন, কি হ'ল ? সুশোভনা সম্বন্ধে হরিশঙ্করবাবু অমত করলেন ? তবে তোমার মুখ এমন হাসি হাসি কেন ? তুমি যে একটি প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়ালে হে !"

"তোমায় বুঝিয়ে বলছি। হরিশঙ্করবাবু একটা বাধা সম্বন্ধে

বিবেচনা ক'রে আজ আমার প্রস্তাবের উত্তর দেবেন বলেছিলেন, জান ত ?"

"কা'ল রাতে তুমি আমায় ব'লে গিয়েছিলে।"

"ওঁর বাবাটা কি শোন। জ্যোৎস্না ওঁর ঔরস-কন্যা নয়, ওঁর পালিতা-কন্যা, একরকম কুড়িয়ে পাওয়া। ও কি জাতের মেয়ে, তা ও তিনি জানেন না। আমরা পাকা হিন্দু, হয়ত সব কথা জানলে আমাদের আপত্তি হ'তে পারে, তাই ছিল ওঁর বাধা। চৌদ্দ বছর পূর্ব্বে, তিন বছর বয়সের সুন্দরী মেয়েটিকে কোথায় কি অবস্থায় তিনি পেয়েছিলেন, সমস্ত আমায় আজ বল্লেন।"

"কোথায় পেয়েছিলেন ?"

"লক্ষ্ণৌয়ে।"

শুনিবামাত্র অমরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল। বলিল, "লক্ষ্ণৌয়ে ?"

সুকুমার বলিল, "হ্যাঁ, লক্ষ্ণৌয়ে। যে বদমাইশরা লক্ষ্ণৌয়ে তোমার বোন্‌কে চুরি ক'রে নিয়ে যায়, তারা ওকে তিনশো টাকায় এক পতিতা স্ত্রীলোকের কাছে বিক্রী করেছিল। হরিশঙ্কর বাবু তার কিছুদিন পরেই সস্ত্রীক লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌবাসী ওঁর এক মুসলমান বন্ধুর কাছে মেয়েটির কথা শোনেন, —আর শোনেন যে, বদমাইশরা বলেছিল, ওটি বাঙ্গালীর মেয়ে। উনি সেই পতিতা স্ত্রীলোককে পুলিসের ভয় দেখিয়ে, তার উপর পাঁচশো টাকা দিয়ে, মেয়েটি কিনে নেন। তার পর থেকে নিজের মেয়ের মত পালন করেছেন। তোমার বোন্ হারানোর

সমস্ত ইতিহাসই আমি তোমার কাছে, তোমার বাবার কাছে, তোমার মা'র কাছে শুনেছিলাম ত! স্থান, কাল, সমস্তই দেখ মিলে যাচ্ছে। সুশোভনাই যে তোমার সেই হারানো বোন্, তাতে আমার মনে ত কোন সন্দেহই নেই।"

অমরেন্দ্র বলিল, "তুমি এ কথা হরিশঙ্করবাবুকে বলেছ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

"তাই, তুমি একবার গিয়ে তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস, আমি নিজে তাঁকে সব কথা জিজ্ঞাসা করি।"

হরিশঙ্করবাবু আসিলেন। বোন্ হারানোর সময় অমরেন্দ্রনাথ বারো বৎসরের বালক। সকল কথাই তার স্মরণ ছিল। হরিশঙ্করবাবুর প্রদত্ত বিবরণ সমস্তই ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল।

অমরেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সুশোভনার বাঁ-কনুয়ের উপরটায় একটা জড়ুল আছে কি? আমার নিজের অবশ্য সেটা ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু মা'র কাছে আমি শুনতাম যে, আমার সে বোনের হাতে ঐ চিহ্ন ছিল।"

হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক সেইখানে জড়ুল আছে।"

স্থির হইল, এখন শোভনাকে এ-সব কথা জানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই; কারণ, হরিশঙ্করবাবু তাহার জন্মদাতা পিতা নহেন শুনিলে বালিকার হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে। বিবাহের পর, সময় বুঝিয়া, প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া সুকুমারই তাহাকে আসল কথা জানাইবে।

ঘড়ি

ঘড়ি অর্থে ঘটিকা-যন্ত্র নহে। উহা একজন ষোড়শী পাহাড়িয়া সুন্দরীর নাম। বায়ু-পরিবর্ত্তন জন্য পাহাড়ে গিয়া সেই ঘড়িকে লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছিলাম, কেবল মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু সে কথা পরে বলিব, আগের কথা আগে বলাই ভাল।

ইদানীং কিছুদিন হইতে আমার স্বামীর শরীরটা তেমন ভাল যাইতেছিল না। মাঝে মাঝে জ্বর হয়, হজমের গোলমাল, রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না—এইরূপ নানাখানা। ঔষধপত্র খান, কিন্তু ফল তেমন পাওয়া যায় না। বয়স হইয়াছে (আমার হয় নাই, আমি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) তার উপর আপিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, (তিনি আলিপুরের ট্রেজরি হাকিম) সহ্য হইবে কেন? তাই তাঁহাকে বলিলাম, "তোমার ছুটি ত ঢের পাওনা রয়েছে, মাস-তিনেকের ছুটি নিয়ে দার্জ্জিলিঙ কি সিমলে পাহাড়ে গিয়ে হাওয়া বদলাবে?"

তিনি বলিলেন, "ছুটি ত পাওনা আছে। কিন্তু বউ, দার্জ্জিলিঙ কি সিমলে পাহাড়ে গিয়ে তিন মাস বাস করা, সে ত বিস্তর খরচ।"

আমি বলিলাম, "টাকা আগে, না প্রাণটা আগে?" বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, প্রাণটাই আগে। এপ্রিল, মে ও জুন তিন মাসের ছুটীর দরখাস্ত করিলেন, এ-দিকে দার্জিলিঙে তাঁহার এক বন্ধুকে চিঠি লিখিলেন, যেন মাসিক শ'খানেক টাকা ভাড়ায় একটি ভাল বাড়ী তিনি ঠিক করিয়া রাখেন।

সংসারে আমাদের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটি ওঁর প্রথম পক্ষের, নাম সুধীরকৃষ্ণ, আমরা ডাকি সুধা বলিয়া। আমায় যখন উনি বিবাহ করিয়া আনিলেন, তখন সুধার বয়স নয় মাস-মাত্র। আমিই সুধাকে মানুষ করিয়াছি। সুধা বড় হইয়া জানিয়াছে বটে যে, আমার গর্ভে সে জন্মে নাই—কিন্তু তাহা মস্তিষ্কের ভিতর জানিয়াছে মাত্র,—হৃদয়ের ভিতর সে জানে যে, আমিই উহার জননী। সুধার বয়স একুশ বছর, সে বি-এ পড়িতেছে, আগামী বৎসর পাস দিবে। কন্যার নাম ইন্দিরা; কিন্তু আমরা ডাকি খুকী বলিয়া—যদিও সে নিতান্ত খুকী নহে, চৌদ্দ বৎসরের হইয়াছে, গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। তাহার বিবাহ এখনও দিই নাই, মেয়ের ষোল বছর বয়স হওয়ার আগে বিবাহ দেওয়া উঁহার মত নয়।

ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে, কিন্তু দার্জিলিঙের বন্ধু চিঠি লিখিয়াছেন, দার্জিলিঙে এবার অত্যন্ত ভীড়, একশো টাকার ভিতর ভাল বাড়ী পাওয়া যাইতেছে না, কার্সিয়াঙে ঐ টাকায় ভাল ভাল বাড়ী পাওয়া যায়, যদি মত হয় ইত্যাদি। উনি বলিলেন, তবে চল,

কার্সিয়াঙেই যাওয়া যাক্। সেইমত চিঠি লিখিয়া দেওয়া হইল। কয়েক দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল—"আমি নিজে কার্সিয়াঙে গিয়া, সেণ্টমেরি পাহাড়ের গায়ে একখানি সুন্দর বাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়াছি, তিন মাসে দুই শত পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিতে হইবে। সেখানে আমার এক বন্ধু ডাক্তার গিরিজা বাবু আছেন, তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি, তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি, কোন্ তারিখে পৌঁছিবেন, তাঁহাকে আপনি পত্র লিখিবেন, তিনি আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।" ইত্যাদি।

গ্রীষ্মাবকাশের জন্ত কলেজ বন্ধ হইতে তখনও তিন সপ্তাহ বিলম্ব আছে, খুকীর ছুটী হইতে বুঝি এক মাস। উনি বলিলেন, খুকীর স্কুল কামাই হয় হউক, সুধার কলেজ কামাই করিয়া কায নাই, শেষে পার্সেণ্টেজের গোলমাল হইতে পারে। সুধা তাহার এক সহপাঠী বন্ধুর সহিত বন্দোবস্ত করিল, তাহাদের বাড়ীতে থাকিয়া তিন সপ্তাহ সে কলেজ করিবে—কলেজ বন্ধ হইলে আমাদের নিকট যাইবে। আমাদের এক বামুন-ঠাকুর আছে, রামখেলাওন নামে এক ভৃত্য আছে এবং সত্ত্ব বা সত্যবতী নামে এক ঝি আছে। আমাদের ক্ষুদ্র সংসার, বেশী চাকর-বাকর লইয়া কি করিব, ইহাতেই আমাদের বেশ চলিয়া যায়। স্থির হইল, বামুন-ঠাকুর ও রামখেলাওন আমাদের সঙ্গে যাইবে, ঝি তিন চারি বৎসর বাড়ী যায় নাই, অনেক দিন হইতে সে ছুটী ছুটী করিতেছিল, তাহাকে তিন মাসের ছুটী দেওয়া গেল।

ধার্য্য দিনে আমরা দুর্গানাম স্মরণ করিয়া দার্জ্জিলিঙ মেলে

গিয়া উঠিলাম। পরদিন প্রাতে সিলিগুড়িতে নামিয়া ছোট রেলে চড়িয়া, পর্ব্বতগাত্রে রেল-লাইন পাতার বিষয়ে ইংরাজের অদ্ভুত কৌশল এবং মেঘের ও ঝরণার অপরূপ খেলা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। রেললাইন কখনও কার্ট রোডের উপর দিয়া কখনও নীচে দিয়া, কখনও পাশে পাশে চলিয়াছে। বেলা দশটার সময় কার্সিয়াং ষ্টেশনে গিয়া নামিলাম।

ডাক্তারবাবু ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের সহজেই খুঁজিয়া লইলেন। আমার স্বামীকে বলিলেন, "এ কি করেছেন আপনারা? রেলে কেন এলেন? আজকাল দার্জ্জিলিং কিম্বা কার্সিয়াং যাত্রী কি কেউ রেলে আসে? সিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সিতে আসে। রেলের চেয়ে তাতে ভাড়াও কম পড়ে, আর দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা আগে পৌঁছান যায়।"

স্বামী বলিলেন, "তা ত আমি জানতাম না। আমি সটান কার্সিয়াঙেরই টিকিট কিনেছিলাম।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "চলুন এখন, বাড়ীতে আপনার সবই ঠিকঠাক ক'রে রেখেছি—মায় চাল-ডাল, তরী-তরকারী, ঘি, মশলা, কাঠ-কয়লা পর্য্যন্ত। একটা নানীও ঠিক ক'রে রেখেছি?"

স্বামী বলিলেন, "নানী কি?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এখানে ঝিকে নানী বলে। আপনি শুধু একজন বামুন আর একজন চাকর নিয়ে আসবেন লিখে-ছিলেন, তাই ঘর সাফ করা, বাসন-টাসন মাজার জন্তে একটা নানী ঠিক ক'রে রেখেছি।"

কেটা-কেটির (পাহাড়িয়া কুলী-কুলিনীর) স্কন্ধে জিনিষপত্র চাপাইয়া, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমরা নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। বাড়ীটির নাম "বেলভিউ কটেজ"—চারিদিকে হাতার মধ্যে অজস্র ডালিয়া, গোলাপ, ফরগেট-মি-নট ও নাম-না-জানা অন্যান্য কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।

ডাক্তারবাবু সব দেখাইয়া শুনাইয়া বলিয়া কহিয়া দিয়া নমস্কারান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

২

নানীকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—এ কি ঝি না মেম-সাহেব? তার ছিটে ঘাগ্‌রার কি বাহার! মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত ঝোলানো ফুলকাটা ওড়নার কি বাহার! পায়ে জুতা মোজা—তবে লেডী জুতা নয়, পুরুষ-মানুষের জুতা। খট্‌-খট্‌ করিয়া এ-ঘর ও-ঘর বেড়ায়, বাসন মাজিয়া শেষে তাহা সাবান দিয়া ধুইয়া ঘরে তোলে, আমাদের সহিত বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে, সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া, চুল আঁচড়াইয়া, তার সাজগোজের কি ঘটা! সদাই গুন্‌-গুন্‌ করিয়া গান গাহে, কর্ম্মের অবসরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া নির্ভীকভাবে "কাটোয়া" পান করে—মনিব বলিয়া গ্রাহ্যও নাই। (কাটোয়া হাতে গড়া খদেশী সিগারেটবিশেষ। বাজারে এক প্রকার কুচোনো তামাক পাতা বিক্রয় হয়, সেই তামাক কাগজে পাকাইয়া সুবৃহৎ সিগারেটের

আকার ধারণ করিলে "কাটোয়া" হয়।) নানীর কার্য্য বাসন মাজা, ঘর ঝাঁড় দেওয়া ও বেড়াইতে যাইবার সময় আমাদের ছাতা প্রভৃতি বহন করিয়া পথপ্রদর্শন করা। এ দেশে এ সময় কখন্ বৃষ্টি আসে, কিছুই ঠিক নাই। হয় ত, যখন বাহির হইলাম, তখন রৌদ্র চম্‌-চম্ করিতেছে, পনের মিনিট পরেই দেখি, ও-মা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি সুরু হইয়া গেল। তাই সঙ্গে ছাতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এমন লোক নাই, এমন স্থান নাই—যাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ নানী বলিতে পারে না; এমন বিষয় নাই—যাহা তাহার অজ্ঞাত। এমন কি, সাহেব লোক মরিলে তাহার কবর খুঁড়িতে নয় ফিট গর্ত্ত করা নিয়ম, তাহাও সে অবগত আছে। সে জাতিতে পাহাড়িয়া (নেপালী) হইলেও হিন্দী বেশ বলিতে পারে; সুতরাং তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আমাদের কোনও অসুবিধা নাই। নানী ডোমারাম বস্তিতে মাসিক দুই টাকা ভাড়ায় এক ঘর লইয়া বাস করে। প্রাতে আসিয়া, এবং রাতে বিদায়কালে নিত্য বলে, বাবু সেলাম, মাইজী সেলাম, খুকী সেলাম, ঠাকুর সেলাম।—যদিও তাহার শুধা মাহিনা, তথাপি ঠাকুর রোজ তাহাকে একথালা ভাত দেয় —তাই ঠাকুরও সেলাম—ঠাকুরের এই খাতির।

আমরা পৌঁছিবার কয়েক দিন পরে খুকী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "মা, শুনেছ, নানীর এক মেয়ে আছে, তার নাম কি জান?"

বলিলাম, "না, কি নাম?"

"তার নাম—ঘড়ি।"—বলিয়া সে হাসিয়া লুটাইতে লাগিল। হাসি থামিলে বলিল, "আচ্ছা মা, সে মেয়েকে যদি আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি করতে হয়, তবে রেজিষ্টারিতে তার কি নাম লেখানো হবে? শ্রীমতী ঘড়িসুন্দরী দেবী?"—বলিয়া পুনশ্চ সে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিল।

আমি বলিলাম, "যেমন অদ্ভুত দেশ, নামগুলোও কি তেমনি অদ্ভুত! কত বড় মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিস্?"

"হ্যাঁ, আমার চেয়ে বড়। নানী বল্লে, তার বয়স সতেরো। কোন্ এক সাহেবের কুঠিতে সে আয়াগিরি করে, মেম-সাহেবের লেড়কা খেলায়। মা, তাকে একদিন নিয়ে আসতে বল না, নানীকে, আমি ঘড়ি দেখ্‌বো।"

বলিলাম, "আচ্ছা, বল্‌বো।"

দু'এক দিন পরে নানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নানী, তোর খসম্ আছে ত?"

নানী বলিল, "উ তো বহুৎদিন ভাগ্ গিয়া।"

বলিলাম, "ভাগ্ গিয়া কি রে? কোথা ভাগ্ গিয়া?"

নানী তখন তার জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিল। বলিল, তাহার কন্যা যখন মাত্র দুই বৎসরের, তখনই তার স্বামী পলাইয়া এক সাহেবের সহিত কলিকাতা চলিয়া যায়। না লেখে চিঠি-পত্র, না পাঠায় টাকা-কড়ি। কিছুদিন তার জন্য অপেক্ষা করিয়া নানী উদরান্নের জন্য, ডাউহিল স্কুলে আয়াগিরি চাকুরী গ্রহণ করে। সে স্কুলে খালি সাহেবদের মেয়েরা পড়ে। অনেক

মেয়ে সেই স্কুলে বাসও করে, বোর্ডিং হাউস আছে, আবার অনেক মেয়ে বাহির হইতে আসিয়া পড়িয়াও যায়। চারি পাঁচ বৎসর পরে, কলিকাতা হইতে আগত এক সাহেবের খানসামার মুখে সে তার স্বামীর সংবাদ পায়। সে নাকি এক বড়া সাহেবের বাবুর্চিগিরি করিতেছে, এবং সেখানেই এক স্বজাতীয়া মেয়েকে বিবাহ করিয়া, নূতন সংসার পাতিয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। সেই সাহেবের ঠিকানায় স্বামীকে সে এক পত্রও লেখাইয়াছিল; কিন্তু কোনও উত্তর পায় নাই। তার পর হইতে কত লোককে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার স্বামীর সংবাদ বলিতে পারে নাই। দুই বৎসর হইল, স্কুলের সে চাকরী তাহার গিয়াছে। তাহার জিম্মা হইতে এক দুষ্ট "বাবা" (মেয়ে) পলাইয়া যায়, তাই সাহেবরা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তারপর হইতে সে কখনও সাহেবের বাড়ীতে আয়াগিরি, কখনও বাঙ্গালীর বাড়ীতে দাসী-গিরি করিয়া জীবন-যাপন করিতেছে।

বলিলাম, "তবে এদিকে দশ বারো বছর তোর স্বামীর আর কোনও খবর পাস্‌নি ?"

"না মাইজী !"

"সে বেঁচে আছে কি ম'রে গেছে তাও জানিস্ না ?"

"না, মাইজী।"

"খোঁজ নে না। যদি ম'রে গিয়ে থাকে, তবে ত তুই আবার সাদি করতে পারিস্। তোদের দেশে ত বিধবা-বিবাহ হয়।"

নানী বলিল, "না মাইজী, সাদি আর আমি করতে চাইনে। পাহাড়ী লোগ বড় মদ খায়, খেয়ে জরুকে মারে। এ আমি বেশ আছি।"

"এখানে তোর মেয়ে ছাড়া আর কেউ আছে ?"

"আছে মাইজী। আমার এক ভাই আছে, সে ক্লারেণ্ডনে চাকরী করে।"

"তার নাম কি ?"

"আঠ নম্বর।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আঠ নম্বর কি রে ? মানুষের নাম কি ও রকম হয় ?"

নানী বলিল, পূর্ব্বে তার অন্য নাম ছিল বটে, কিন্তু ক্লারেণ্ডনে ঢুকিয়া অবধি তাহার নাম হইয়া গিয়াছে আঠ নম্বর। ঐ নামেই সকলে তাকে ডাকে।"

কর্ত্তার কাছে আমি এই গল্প করিলে তিনি বলিলেন, নানীর ভাই বোধ হয়, ক্লারেণ্ডন হোটেলে ৮নং খিদমৎগার। মন্টিক্রেষ্টো গল্পের নায়ক এডমণ্ড ড্যাণ্টেসের সুদীর্ঘ কারাবাসকালে তাহার নাম লুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া যেমন একটা নম্বরে পরিণত হইয়াছিল, ইহাও বোধ হয় তাই।

আমার অনুরোধে নানী তাহার মেয়েকে একদিন লইয়া আসিল। দেখিলাম, মেয়েটি বেশ সুশ্রী, নূতন যৌবন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঢল্ ঢল্ করিতেছে, বেশ সভ্য-ভব্য, ফিট্-ফাট্। পাহাড়িয়া মেয়েদের বস্ত্রেই তাহার অঙ্গ আবৃত, তথাপি উহা তাঁর

মাতার অপেক্ষা দামী ও সুদৃশ্য। মা মাথায় দেয় সূতি ওড়না, মেয়ের মাথায় সিল্কের ওড়না। মা'র মত সে মামুলী জুতা-মোজা পরে না—সিল্কের ফ্লেশ-কলার মোজার উপর রীতিমত লেডি জুতা। মা'র মত সে 'কাটোয়া' পান করে না, কাঁচি সিগারেট খায়। কর্ত্তার সাক্ষাতেও সে সিগারেট ধরাইল, কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। নানী বলিল, যে সাহেব-বাড়ীতে সে চাকরী করে, সেখানে মাসে পঁচিশ টাকা বেতন পায়—সব টাকাই নিজ বিলাসিতায় ব্যয় করে। খুকী ত ঘড়ি দেখিয়া মহা খুসী।

কয়েক দিন পরে শুনিলাম, ঘড়ির সে চাকরী গিয়াছে, তাহার মনিব সাহেব অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছেন, ঘড়ি অন্য চাকরীর চেষ্টায় আছে। এখন সে প্রতিদিন তার মা'র সহিত আমাদের বাড়ী আসিতে লাগিল। খুকীর সহিত তার খুব ভাব হইয়া গেল। এখন সে প্রতিদিন ঘড়ি দেখিতেছে। তার সঙ্গে খুকী লুডো খেলে, তাস খেলে, ঘুঁটি খেলে—এই শেষের খেলাটি খুকীই তাহাকে শিখাইয়া লইয়াছে।

৩

আমরা এক মাস কার্সিয়াঙে আসিয়াছি, ইতিমধ্যে কর্ত্তার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যাইতেছে। জ্বর আর হয় নাই, হজমের গোলমালও নাই, রাত্রিতে বেশ নিদ্রাও হইতেছে। আরও উন্নতি হইত, যদি তিনি আরও বেশী করিয়া বেড়াইতেন।

সকালের দিকে তিনি মোটেই বাহির হইতে চান না—আমি খুকীকে লইয়া বাহির হই। সঙ্গে অবশ্য মানী যায়,—আমাদের ছাতা, ওভার-কোট প্রভৃতি বহন করিয়া। বেড়াইতে যাইতে মানীর মহা উৎসাহ। বিকালে চা-পানের পর কর্ত্তাকে লইয়া বাহির হই। বেশী হাঁটিতে তিনি পারেন না, বুড়া মানুষ ত! অথচ—বুড়া বলিবার যো নাই, বলিলে রাগ করেন। তিনি যখন আমায় বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ষোল, তাঁহার বয়স চৌত্রিশ বৎসর মাত্র—পূর্ণ যুবাকাল। তখন তিনি আমার চিঠি লিখিয়া নীচে সহি করিতেন—"ইতি তোমার বুড়ো।"—এখন, বিশ বৎসর পরে, আর তিনি নিজেকে বুড়া বলিয়া স্বীকার করিতে চান না।

এক সপ্তাহ হইল, সুধার কলেজ বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু এখনও সে আসে নাই। সে জন্য আমরা মহা ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছি আমরা যখন কলিকাতা ছাড়িয়াছিলাম, তখনও মহাত্মা গান্ধীর লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় নাই। লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার কথা এখানে আসিয়া খবরের কাগজে পড়িয়াছি। মহিষবাথানে গোলমালের কথা, যতীন সেনগুপ্তের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের কথা প্রভৃতিও পড়িয়াছি। প্রত্যহই সংবাদপত্রে দেখি, গোলমাল বাড়িয়াই চলিয়াছে, থামিবার কোনও লক্ষণ নাই। সুধা যদি সত্যাগ্রহী দলে যোগদান করে নাই, তথাপি আমরা জানি তাহার ষোল আনা ঝোঁক সেই দিকেই। কলেজ বন্ধ হইল, ছেলে কলিকাতায় কি করিতেছে? এমন সময় কর্ত্তার নামে সুধার

এক পত্র আসিল, সে পত্র পড়িয়া আমাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে সে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাহার পিতাকে লিখিয়াছে—

"আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ফল কি হইল? যে ফল দশ বৎসর পরে প্রকট হইবে, সে ফলের কথা না ধরিলেও আমরা যে আশাতীত ফল পাইয়াছি, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আপনি লাঠি লইয়া মারিতে আসিলে আমিও লাঠি লইয়া মারিতে যাই, এটা সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু আপনি তোপ-বন্দুক লইয়া গুলী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন, আর আমি বুক ফুলাইয়া 'মারো' বলিয়া দাঁড়াই, এটা বাঙ্গালীর পক্ষে ত বটেই, সকল জাতির পক্ষেই অসাধারণ ব্যাপার। আর যেখানে এরূপ ব্যাপার একটি দু'টি নহে, সহস্রাধিক হইয়া গিয়াছে, সেটাকে আশাপ্রদ চিহ্ন বলিয়াই ধরিতে হইবে।"

কলিকাতার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছে—

"সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বিষয়, বিনা চেষ্টায়, বিনা প্রোপাগাণ্ডায় একদিনে বাঙ্গালী সিগারেট ছাড়িয়া দিয়াছে। কোনও পাণওয়ালার নিকট সিগারেট পাইবেন না। একজন নির্ল্লজ্জ বাঙ্গালী এক খোট্টা পাণওয়ালার কাছে কাঁচি-মার্কা সিগারেট চাহিয়াছিল, সে খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—'বাবু, কাঁচি-মার্কা নেহি হ্যায়, জুতি-মার্কা হ্যায়, খাওগে'?"

ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পত্রে সে তার পিতাকে কর্ম্মে ইস্তফা দিবার জন্য বিশেষ অনুনয় করিয়া লিখিয়াছে।

পত্র পড়িয়া উনি ত তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। বলিলেন, "দেখেছ ছেলে বেটার কাণ্ড! আমি জয় মহাত্মা গান্ধী ব'লে চাকরীটি ছেড়ে দিই, তারপর খাই কি? নুণ? নুণ খেয়ে ক'দিন বাঁচবো?"

ছেলেটা পাছে সত্যাগ্রহীর দলে ভিড়িয়া যায়, এই ভাবনায় আমরা স্বামি-স্ত্রী অস্থির হইয়া উঠিলাম। বুদ্ধি খাটাইয়া ছেলেকে পত্র লিখিলাম—

"বাবা সুধা, উনি তোমার পত্র পাইয়াছেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ নিজে উত্তর লিখিতে পারিলেন না। শরীরের উন্নতির জন্য পাহাড়ে আনিলাম, কিন্তু উন্নতি তেমন ত দেখিতে পাইতেছি না। বিদেশ-বিভূঁই, যদি অসুখ বাড়ে, তবে আমি একা স্ত্রীলোক তাঁহাকে লইয়া আতান্তরে পড়িয়া যাইব। এক সপ্তাহ হইল, তোমার কলেজ বন্ধ হইয়াছে, তুমি সেখানে কেন দেরী করিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। পত্রপাঠমাত্র তুমি চলিয়া আসিবে, একটি দিনও বিলম্ব করিও না।"

এ চিঠির ফল ফলিল, সুধা চলিয়া আসিল। পোষাক তাহার আগাগোড়া খদ্দরে নির্ম্মিত। খুকীর ও আমার জন্য এক বোঝা খদ্দরের শাড়ী, সেমিজ প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছে। বলিল, "মা, তোমাদের খদ্দর ছাড়া অন্য কিছুই আর পরা চলবে না।" আমি বলিলাম, "খদ্দর ত পরবোই বাবা! কিন্তু যা আছে, সে কাপড়-চোপড়গুলো ছিঁড়ুক আগে।" প্রথমে সে বলিল, ও-সব পোড়াইয়া ফেলাই উচিত। অনেক টাকার জিনিষ, সব

পোড়াইয়া লোকসান করিবার মত অবস্থা আমাদের নয়, এই সব অজুহাতে শেষে রফা হইল, বাড়ীতে সেগুলা পরা চলুক, কিন্তু বেড়াইতে বাহির হইবার সময় খদ্দরই পরিতে হইবে। তথাস্তু।

সুধা আসিয়া চা খাইল না, বলিল, উহাতে বিলাতী চিনি আছে, তা ছাড়া ওটা একটা অনাবশ্যক বিলাসিতা। উনি এখানে আসা অবধি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কিনিতেন—সুধা আসিয়া তাঁহার ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কেনা বন্ধ করিয়া দিল। দেশী খবরের কাগজ পূর্ব্বাবধিই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং কলিকাতার, তথা সারা দেশের আর কোনও সংবাদ পাই না। একদিন লোকমুখে শুনিলাম, মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সেদিন সুধা উপবাস করিবে বলিয়া বাহানা ধরিল। অনেক কষ্টে তাহাকে কিছু দুধ ও মিষ্টান্ন খাওয়াইলাম, আমিও তাহাই খাইয়া রহিলাম। ছেলে উপবাসী—মা খায় কোন্ লজ্জায়?

৪

তিন চারি দিন পরে খুকী আসিয়া বলিল, "মা, ঝড়ি বেশ ইংরেজী কথা কইতে পারে। দাদার সঙ্গে [illegible] ক'রে ও ইংরেজী বলছিল, আমি ত বুঝতেই পারলাম না।"

নানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ নানী, তোর মেয়ে ইংরেজী কথা কইতে জানে?"

সে বলিল, "হ্যাঁ মাইজী, জানে বৈ কি। আমি যখন ডাউহিল

স্কুলে চাকরী করতাম, ও তখন ইংরাজ বাবাদের সঙ্গেই খেলা করত কি না। সেখানকার বড় সাহেব যিনি ছিলেন, তিনি পাদরী। তিনি দয়া ক'রে ইংরাজ মেয়েদের সঙ্গে ক্লাসে ব'সে ওকে পড়তে হুকুম দিয়েছিলেন,—যদিও কোনও কালা আদমির মেয়েকে সেখানে ভর্ত্তি করা হয় না।"

ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ সুধা, ঝড়ি নাকি ইংরেজী বল্‌তে পারে?"

সুধা বলিল, "হ্যাঁ মা, ও বেশ ইংরেজী বলে। কিন্তু কথা যেমন বলতে পারে, বই তেমন পড়তে পারে না। আর, বানান সব অশুদ্ধ। কাণে শুনে শেখা কি না। আমি ওকে বই পড়তে শেখাব মনে করছি। খুকীও সেই সঙ্গে পড়বে।"

দুই একদিন পরে দেখিলাম, খুকী ও ঝড়িকে লইয়া সুধা রীতিমত স্কুল খুলিয়া বসিয়াছে। দু'বেলায় তিন চারি ঘণ্টা উহাদের পড়ায়।

কর্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "ও পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে সুধাকে মিশতে বারণ ক'রে দিও।"

আমি বলিলাম, "কেন, তাতে আর দোষ কি?"

তিনি বলিলেন, "তোমার সোমত্ত ছেলে, ঐ সুন্দরী সোমত্ত মেয়েটার সঙ্গে বেশী মেশা কি ভাল? শেষে কি থেকে কি হবে বলা যায় কি? জান ত, চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, ঘি আর আগুন একসঙ্গে স্থাপন করবে না।"

আমি বলিলাম, "না না, ছেলে আমার সে চরিত্রের নয়।

কোনও ভয় নেই। ঐ একটা নেশা নিয়ে মেতে আছে, থাকুক না। নয় ত শেষে কোন্ দিন ব'লে বস্‌বে, চল্লাম আমি স্কুল তৈরী করতে।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

দিন পনেরো পরে একদিন খুকী আসিয়া চুপি চুপি আমায় বলিল, "মা, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"—তার চক্ষু ছ'টি ছল্‌ছল্।

ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে রে ?"

"ঘড়িকে দাদা ভালবাসে। ওকে বিয়ে করবে।"

বলিলাম, "দূর পাগ্‌লী! ঘড়ি হ'ল পাহাড়ি-মেয়ে, ওকে তোর দাদা বিয়ে করতে যাবে কেন ?"

খুকী বলিল, "হ্যাঁ মা, দাদা ওকে ভালবেসেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঘড়ির বই-খাতার মধ্যে একখানা কাগজ রয়েছে, তাতে লেখা আছে, I love you—তার মানে, আমি তোমায় ভালবাসি। দাদার নিজের হাতের লেখা—আমি দাদার হাতের লেখা চিনি ত!"—বলিতে বলিতে মেয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

কাঁদিবার তাহার কারণ আছে। উহাদের ক্লাসেই একটি মেয়ে পড়ে, উহার চেয়ে বছর ছুইয়ের বড়, তার নাম লীলাবতী ব্যানার্জ্জী। আমার স্বামী মুখার্জ্জী। খুকী তাহাদের বাড়ী যায়, লীলাও আমাদের বাড়ী আসে। ছুই জনে অত্যন্ত ভাব। খুকীর একান্ত ইচ্ছা, সেই লীলার সঙ্গেই তার দাদার বিবাহ হয়। বালিকাদের এই মতলব শুনিয়া, লীলার মাও নিজে আমার কাছে এই প্রস্তাব করিয়াছেন,—তবে আমি এখনও স্পষ্টাক্ষরে

আমাদের সম্মতি জানাই নাই। মেয়েটি দেখিতে শুনিতে ভাল, তাহার পিতাও সম্পন্ন লোক; সুতরাং প্রাপ্তিযোগও ভাল আছে, হইলে মন্দ হয় না। উঁহার ইচ্ছা, ছেলে বি-এ পাস করিয়া ডেপুটী হইলে তবে তাহার বিবাহ দিবেন, সেই জন্যই লীলার মাকে আমি স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলি নাই। খুকী আমার মন ভিজাইবার জন্য সময়ে অসময়ে লীলার নানা সদ্‌গুণের কথা আমায় বলিয়া থাকে। তাই এ ব্যাপারে খুকীর এত দুঃখ।

কথাটা শুনিয়া আমার মাথায় ত বজ্রাঘাত হইল। লীলার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিই আর না দিই, একটা পাহাড়িয়া মেয়ের সঙ্গে দিব কেন? কর্ত্তাকে গিয়া জানাইলাম। শুনিয়া তিনি খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "সেই কালেই আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিই নি?"—খুব খানিকটা বকিলেন। তা বকুন, বকুনি আমার পাওনা হইয়াছে বৈ কি। আমি চুপ্-চাপ্ বসিয়া বকুনি হজম করিয়া, শেষে বলিলাম, "সে ত যা হবার তাই হয়ে গেছে, এখন উপায় কি বল?"

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিবার পর তিনি বলিলেন, "সুধা যে ওকে বিয়ে করতে চায়, সে কথা তোমায় কে বল্লে? সুধা বলেছে?"

উত্তর করিলাম, "না, সুধা বলেনি, খুকী বল্লে। ঐ যে ইংরেজীতে ওকে লিখেছে, আমি তোমায় ভালবাসি।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "খুকী এখন নভেল পড়তে শিখেছে কি না, ও মনে করে, ভালবাসলেই বুঝি বিয়ে করতে হয়। আমার

ত মনে হয়, বিয়ে করবার কল্পনা সুধা করেনি, এত নির্বোধ সে নয়। তুমি পাহাড়ী মেয়েদের চরিত্র জান না, ওদের এ বিষয়ে নীতিজ্ঞান খুব শিথিল, কিন্তু আমি যা আশঙ্কা করছি, তাই যদি হয়ে থাকে বা হবার উপক্রম হয়ে থাকে, সেও ত ঠিক নয়। অত্যন্ত অন্যায়। তুমি এক কাষ কর। মেয়েটাকে ত বিদায় করই, নানীকেও বিদায় কর। এ বিষয়ের জড় মেরে দাও।"

কর্ত্তার আদেশ প্রতিপালন করিলাম। নানীকে তাহার বেতন চুকাইয়া দিয়া বলিলাম, "তুমি আর কাল থেকে এস না, আমি অন্য নানী ঠিক করবো।"

নানী "কাহে মাইজী, কেয়া কসুর হুয়া?" ইত্যাদি কত কথা বলিল, আমি গম্ভীর হইয়া রহিলাম, কোনও উত্তর দিলাম না।

ঘণ্টাখানেক পরে সুধা আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, নানীকে তুমি জবাব দিয়েছ? কি দোষ হয়েছে ওর?"

গম্ভীরভাবে বলিলাম, "ওর কোনও দোষ হয় নি। দোষ হয়েছে তোমার।"

সুধা বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার? কি দোষ করেছি আমি?"

আমি কঠোরভাবে বলিলাম, "দোষ করনি তুমি? ধাড়ি একটা যুবতী মেয়ে, ওর সঙ্গে কি ব্যবহার করছ তুমি? আমাদের এতদিন ধারণা ছিল, তুমি অতি সৎ ছেলে। তুমি যে এমন ইতর হ'তে পার, তা ত আমরা জানতাম না। তোমার এই ইতর

ব্যবহারে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, উনি ত রেগে কাঁই হয়েছেন।"

সুধা পূর্ব্ববৎ বিস্মিতভাবে বলিল, "কেন, কি ইতর ব্যবহার করেছি আমি ?"

"তুমি ওকে ইংরেজীতে লেখনি—'আমি তোমায় ভালবাসি ?' খুকী ওর খাতা-পত্রের মধ্যে সেই কাগজ দেখেছে, খুকী তোমার হাতের লেখা চেনে।"

সুধা বলিল, "ওঃ, এই কথা ? তবু ভাল। হ্যাঁ মা, আমি ও কথা তাকে লিখেছি বটে, কিন্তু আমি ত কোনও, কি বলে গিয়ে, dishonourable—অর্থাৎ অসাধুভাবে ও-কথা তাকে লিখিনি। আমি তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছি এবং সেও আমায় গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে।"

বলিলাম, "সে কি রে ? বামুনের ছেলে হ'য়ে তুই একটা অজাতের মেয়েকে বিয়ে করবি ?"

সুধা বলিল, "কেন মা, তাতে দোষ কি ? সেও ভারতবর্ষে জন্মেছে—নেপাল ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত, আমিও ভারতবর্ষের সন্তান। মহাত্মা বলেছেন, জাতিভেদ-প্রথা এ দেশ থেকে যত শীঘ্র উঠে যায়, ততই মঙ্গল।"

বলিলাম, "জাতিভেদ তুই না মানিস, আমরা ত মানি। কেন, বাঙ্গালা-দেশে স্বজাতির ঘরে ইংরেজী কইতে পারে, এমন মেয়ে কি নেই ? ঋড়িকে বিয়ে করবার মতলব তোর কেন হ'ল ? এত দিন যে তোকে খাইয়ে পরিয়ে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করলাম,

তার কি এই প্রতিফল তুই দিচ্ছিস্ আমাদের ? যে আমার বাসন মাজা ঝি, তাকে আমায় বল্‌তে হবে বেয়ান ? আর ঋড়ির বাপ কোন সাহেবের বাবুর্চ্চি, উনি তাকে বেয়াই ব'লে অভ্যর্থনা করবেন ?"

সুধা বলিল, "মানুষ যে, সে মানুষ,—সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান,—জন্মগত বা কর্ম্মগত হীনতার জন্যে মানুষে মানুষে প্রভেদ করা ত উচিত নয় মা"—বলিয়া মানবের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে সে মস্ত এক লেক্‌চার ঝাড়িল। সব কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সুধাও কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "শোন মা, আমার জীবনের প্রোগ্রাম তোমায় বলি। তোমরা যে মনে করেছ, আমি বি-এটা পাস করলেই লাটসাহেবকে ধ'রে বাবা আমাকে একটি ডেপুটি বানিয়ে দেবেন, সেটি হচ্চে না। আমি চিরজীবন দারিদ্র্য বরণ ক'রে নিয়ে দেশের কাযে আত্মসমর্পণ করতে চাই। সে কাযে একজন উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী আমার আবশুক। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছি, ঋড়িই আমার জীবনসঙ্গিনী হবার উপযুক্ত। প্রথমতঃ সে চির-স্বাধীন নেপাল দেশের মেয়ে, চির-পরাধীন বাঙ্গালীর মেয়ে নয়। জীবনের কর্ম্মে যখন আমার অবসাদ আস্‌বে, নৈরাশ্য আস্‌বে, ক্লৈব্য আস্‌বে, সে তখন তার নৈতিক বল দিয়ে আমাকে আবার সঞ্জীবিত ক'রে তুল্‌তে পারবে।"

আমি বলিলাম, "তোমার জীবনের কর্ম্মে ও তোমার সহায়

হবে কি বিয় হবে, এখন থেকে তা তুমি কি ক'রে বুঝলে বাপু ?"

সুধা সোৎসাহে বলিল, "তা আমি না বুঝেই কি এ কাযে প্রবৃত্ত হচ্ছি মা ? আমার সঙ্গে দারিদ্র্যের কঠোর জীবনযাপন করতে ও হাসিমুখে প্রস্তুত। ও বলেছে, এক মুঠো ভুট্টা-ভাজা খেয়ে ও দিন কাটিয়ে দিতে পারে ! ওর কাপড়-চোপড় যা আছে সেগুলো ছিঁড়ে গেলে খদ্দর ভিন্ন আর কিছু ও পারবে না, প্রতিজ্ঞা করেছে। দিনে ও এক প্যাকেট ক'রে কাঁচি সিগারেট খেত, প্রকাশ্যভাবেই খেত—এ দিকে তিন চারিদিন আর ওকে সিগারেট খেতে দেখেছ ? তুমি বোধ হয় অত লক্ষ্য কর নি—সিগারেট ও একদম ছেড়ে দিয়েছে। পাহাড়ীরা চা না খেলে বাঁচে না, সে চা ও ও ছেড়ে দিয়েছে। আমি মহাত্মা গান্ধীর একখানি ছবি দিয়েছি, সেখানি ও বাড়ী নিয়ে গিয়ে মাথার শিয়রে রেখেছে, সকালে উঠে ভক্তিভরে সেই ছবিকে ও প্রণাম করে। ওকে আমার চাই মা—ওকে না পেলে জীবনের ব্রত একা উদ্‌যাপন করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হবে।"

"কিন্তু বাবা, কর্ত্তার হুকুমে আমি কাল থেকে নানীকে জবাব দিয়েছি।"—ছেলের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, উপস্থিত ইহার বেশী আর কিছু বলিতে সাহস করিলাম না।

সুধা বলিল, "এ বাড়ী ছাড়াও ভগবানের পৃথিবীতে যথেষ্ট স্থান আছে মা।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কর্ত্তাকে গিয়া সকল কথা জানাইলাম। তিনি খানিকক্ষণ

চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ছেলেটার অদৃষ্টে যদি এতদূর অধোগতিই লেখা থাকে, তবে তাই হবে।"

তাই হবে কি? আমার ছেলে বিবাহ করিবে ঐ ঝিয়ের মেয়েকে? কখনই তা হইতে দিব না। হিন্দুধর্ম্ম কি মিথ্যা? দেব-দেবীরা কি নিদ্রিত? আমি মা মঙ্গলচণ্ডীর শরণ লইব, দেখি, তিনি আমার মঙ্গলবিধান করেন কি না, এ বিপদ হইতে আমায় উদ্ধার করেন কি না—আমার ছেলের মতিগতি ফিরাইয়া দেন কি না। আমি মনে মনে মাকে বারংবার প্রণাম করিয়া একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "হে মা-মঙ্গলচণ্ডী, আমার ছেলেকে সুমতি দাও, আমি তোমায় ষোল আনার পূজা দিব।"

ঘড়িকে ত বিদায় করিলাম। কিন্তু সংবাদ পাইলাম, প্রতিদিন বিকালে সুধা বেড়াইতে বাহির হইয়া ঘড়ির সঙ্গে মিলিত হয়, তাহাকে লইয়া দুই তিন ঘণ্টা বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে।

একদিন খুকী সুধাকে বলিল, "দাদা, তুমি আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাও না, একলা যাও কেন?"

"তোদের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় কৈ?"

"কার সঙ্গে বেড়াও, ঘড়ির সঙ্গে?"

প্রশ্ন শুনিয়া সুধা রাগে কট্‌মট্‌ করিয়া ভগিনীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, "আমার যা খুসী তাই করি, তোদের কি?"

খুকী বলিয়াছিল, "না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। ঘড়িকে নিয়েই বেড়াও ত?"

সুধা বলিয়াছিল, "হ্যাঁ, আমি তাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করছি।"

আট দিন কি দশ দিন পরে, একদিন বেলা দশটার সময় গোইখাল হইতে বেড়াইয়া ফিরিতেছি, বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া মনে হইল, তরকারীপাতি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, একবার বাজারটা দেখিয়া যাই। সুতরাং রামখেলাওনকে বিদায় দিয়া খুকীকে লইয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

মইলির দোকানে ঢুকিয়া তরকারীপাতি দর করিতেছি, এমন সময় খুকী আমার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "মা, দেখ, ঐ খড়ি না?"

রাস্তার অপর দিকে একটা দোকানের সামনে আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া যেন খড়ির মতই একটা মেয়ে দাঁড়াইয়া কি কিনিতেছে। জিনিষ লইয়া সে রাস্তায় উঠিবামাত্র দেখিলাম, খড়িই বটে, হাতে এক প্যাকেট সিগারেট। একটা সিগারেট বাহির করিয়া, ধরাইয়া সে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল—আমরা মইলির দোকানের ভিতর ছিলাম, আমাদের অবশ্য সে দেখিতে পাইল না।

খুকী বলিল, "তবে যে মা, দাদা বলে, খড়ি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে!"

বলিলাম, "নিজের চোখেই ত দেখ্‌লি। দাদাকে তোর বলিস্ গিয়ে।"

খুকী বলিল, "হুঁঃ—দাদা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি না! মনে করবে, তার মন ভাঙাবার জন্যে আমি মিছে কথা বলছি।"

মনে বড় ধিক্কার হইল। বাঃ, আমার বউমা, প্রকাণ্ড বাজারের মধ্য দিয়া, সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিয়াছেন! কি ভাগ্যবতী শাশুড়ী আমি!

তরকারী কিনিয়া একটা কেটি (যুটিয়ানী বালিকা) লইয়া খুকীর সহিত আমি সেই দোকানটায় গেলাম। দেখিলাম, দোকানদার খোট্টা নয়—একজন পাহাড়িয়া। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু আগে একজন পাহাড়িয়া মেয়ে তোমার দোকান হইতে এক প্যাক সিগারেট কিনিয়া লইয়া গেল, ও কে বলিতে পার?"

দোকানদার বলিল, "ওর নাম ঘড়ি। কেন মাইজী, উহাকে আপনার কোন দরকার আছে কি?"

আমি বলিলাম, "না, উহার মা আগে আমার বাড়ীতে চাকরী করিত, উহাকে দেখিয়াছিলাম, চেনা-চেনা মনে হইতেছিল, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম।"

দোকানদার বলিল, "ও রোজ এই সময় আসিয়া এক প্যাকেট করিয়া কাঁচি সিগারেট কিনিয়া লইয়া, আপনার কাযে যায়।"

"কি কায করে ও?"

"কাছারীর রাস্তায় পাহাড়িয়া মেয়েদের জন্য যে ইংরেজী

স্কুল খুলিয়াছে, সেই স্কুলে ও পড়ায়। সাড়ে দশটায় স্কুল বসে।"

"ওঃ"—বলিয়া কিঞ্চিৎ সওদা তাহার দোকান হইতে কিনিয়া আমি গৃহে ফিরিলাম।

খুকীর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিলাম, বেড়াইতে বাহির হইবার সময় সুধাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে এবং বেলা দশটার সময় বাজারের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, যাহাতে ঘড়ির কীর্ত্তি সে দেখিতে পায়।

পরদিন চা-পানের পর খুকী সুধার ঘরে গিয়া বলিল, "দাদা, বিকেলে ত তুমি আমাদের একদিনও বেড়াতে নিয়ে যাবে না, তোমার ঘড়িকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করবার সেই সময়। যা হোক, বাবা বিকেলে বেরোন, তোমার জন্যে কিছু আটকায় না। এ বেলা ত বাবা বেরোন না, এ বেলা কেন তুমি আমাদের সঙ্গে চল না।"

সুধা বলিল, "কেন, রামখেলাওনকে সঙ্গে নিয়ে যা না।"

খুকী বলিল, "রামখেলাওন ত যাবেই, নইলে ছাতা-টাতা-গুলো বইবে কে? তুমি আমাদের সঙ্গে একদিনও বেরোও না ব'লে মা কত দুঃখ করেন।"

সুধা বলিল, "করেন না কি? আচ্ছা, তবে চল, আমিও যাচ্ছি।"

যে মতলব করিয়া সুধাকে বেড়াইতে লইয়া গেলাম, তাহা সিদ্ধ হইল না। দশটার পূর্ব্বে বাজারের ভিতর ঢুকিয়া তরকারী

কিনিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এবং মাঝে মাঝে সেই দোকানের দিকে চাহিতে লাগিলাম ; কিন্তু ঘড়িকে দেখিতে পাইলাম না। দশটা বাজিল, সওয়া দশটা হইল, সাড়ে দশটা হইয়া গেল, তথাপি ঘড়ির দর্শন নাই। অবশেষে ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

সে রাত্রিতে একমনে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকিতে লাগিলাম। কেন মা, আমার প্রতি এমন নিদয়া হইলে তুমি ? তোমার চরণে আমি কি অপরাধ করিয়াছি মা, যে জন্ত আমার মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ করিতেছ না ?

পরদিন প্রাতে আবার সুধাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। ফিরিবার পথে দশটার পূর্ব্বে বাজারেও প্রবেশ করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না।

সে দিন বিকালে সুধা যেমন বেড়াইতে বাহির হয়, সেইরূপই হইল। অন্ত দিন কর্ত্তার সঙ্গে আমরা বেড়াইয়া ফিরিবার অল্পক্ষণ মধ্যে সেও ফিরে। কিন্তু আজ তাহার বিলম্ব হইতে লাগিল।

যত রাত্রি হইতে লাগিল, ভাবনাও তত বাড়িতে লাগিল। এত দেরী কেন ? ছেলের কোন বিপদ-আপদ ঘটিল না ত ? উঁহাকে বলিলাম, উনি তাচ্ছীল্যভরে বলিলেন, "কচি খোকাটি ত নয়, ভাবনা কিসের ? যখন হয় আসবে। রাত হ'ল, আমাদের খাবার দিতে বল।"

খুকীর ও উঁহার খাবার দিতে বলিলাম। আমার ঠাঁই হয় নাই দেখিয়া উনি বলিলেন, "তুমি এখন খাবে না ?"

প্রবীণা গৃহিণীরা আমায় ক্ষমা করিবেন। চিরদিন স্বামীর সঙ্গে বিদেশে বিদেশে কাটাইয়াছি, যদিও সাহেব-মেম বনি নাই, বিশেষ কোনও অখাদ্য কুখাদ্য খাই না, মেঝের উপর আসন পাতিয়া বসিয়া কাঁসার থালা-বাটিতে ভাত-ডালই খাইয়া থাকি, তথাপি স্বামী ও পুত্র-কন্যা সহ একত্র বসিয়া খাওয়াই আমাদের প্রথা। নহিলে উনি ছাড়েন না। সেই যে কথায় বলে না—

'পড়েছি যবনের হাতে
খানা খেতে বলে সাথে।'

—আমারও হইয়াছে তাই।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, "সুধা আগে বাড়ী আসুক, তার পর খাব।"

তিনি আর কোন কথা না বলিয়া, আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে পাণ-জল দিলাম, ভৃত্য তামাক সাজিয়া দিল।

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল, কিন্তু সুধা ফিরিল না। মা হওয়া বড় জ্বালা! বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিলাম। ভৃত্যও লণ্ঠন লইয়া ছেলেকে খুঁজিতে বাহির হইবে কি না ভাবিতেছি, এমন সময় আমাদের বাড়ী উঠিবার পথে টর্চ্চলাইট পড়িল। ঐ বোধ হয় সুধা আসিতেছে।

টর্চ্চ-লাইট আমাদের বাড়ীর দিকেই উঠিতে লাগিল। সুধা আসিল। "হ্যাঁ রে, এত রাত্তির করলি কেন?" বলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভীত হইয়া পড়িলাম। মুখ শুকাইয়া

এতটুকু হইয়া গিয়াছে, চোখের দৃষ্টিও কেমন বিভ্রান্ত। উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ বাবা, শরীর ভাল আছে ত?" বলিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, গরম নয়।

"চল মা, বল্‌ছি"—বলিয়া সুধা তাহার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া সুধা বলিল, "তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে মা?"

বলিলাম, "উনি খেয়েছেন, খুকীও খেয়েছে।"

"তুমি খাওনি কেন মা?"

"ছেলের খাওয়া না হ'লে মা কি খেতে পারে বাবা?"

সুধা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কোঁস্-কোঁস্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া মুখ হইতে হাত টানিয়া খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বাবা অমন করছিস্? কি হয়েছে?"

সুধা হঠাৎ তক্তপোষ হইতে নামিয়া আমার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া ক্রন্দনের স্বরে বলিল, "আমি বড় অভাগা, মা! আমায় তুমি মাফ্ কর।"

আমি তাহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিতে করিতে বলিলাম, "কেন রে, কি হয়েছে, শীগ্‌গির বল্ বাবা, আমার যে কান্না পাচ্ছে।"

সুধা বলিল, "তোমাদের কথার অবাধ্য হ'য়ে, তোমাদের মনে দুঃখ দিয়ে, খড়িকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, সে সঙ্কল্প

আমি পরিত্যাগ করেছি মা। আমার অপরাধ তোমরা ক্ষমা কর।”

এ কথা শুনিয়া আনন্দে মন উল্লসিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম, “জয় মা মঙ্গলচণ্ডী, এ কলিতে তুমিই মা জাগ্রত দেবতা। ষোল আনার পূজো মেনেছিলাম, আমি বত্রিশ আনার পূজো তোমায় দেব মা—কলকাতায় ফিরেই।” কিন্তু মনের আনন্দ মনেই চাপিয়া, দুঃখের অভিনয় করিয়া বলিলাম, “তা সে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেছ, ভালই করেছ। কিন্তু কি হ'ল বাবা?”

সুধা কোঁপাইতে কোঁপাইতে বলিল, “মহাত্মাকে সে অপমান করেছে মা!”

“কি ক'রে অপমান করলে?”

“মহাত্মাকে সে গান্ধী-চ্যাপ্ বলেছে, আরও অকথা কুকথা বলেছে।”

“কি রকম? তোমার সাক্ষাতে এমন সব কথা বলতে সে সাহস করলে?”

“আমার সাক্ষাতে নয় মা। আমি তার সঙ্গে রোজ যেমন বেড়াই, তেমনি বেড়িয়ে, তাকে উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে বাড়ী আসছিলাম। সেও বাড়ীর দিকে গেল। খানিক দূর এসে হঠাৎ মনে হ'ল, তাকে আর একটা কথা ব'লে আসি। যদি তার নাগাল পাই, এই ভেবে ফিরে গেলাম। ষ্টেশনের কাছে গিয়ে তাকে দেখতে পেলাম। তখন সে আর একা নয়; ইংরেজী কাপড় পরা একটা পাহাড়ী ছোঁড়াও তার সঙ্গে আছে।

ঢুকলে গিয়ে এক পাণওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়াল। ওরা কথাবার্ত্তা কি কয়, শোনবার জন্তে আমি নিঃশব্দে তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছোঁড়াটা পাণওয়ালার কাছে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট চাইলে। পাণওয়ালা বল্লে, 'বিলাতী সিগ্রেট বেচ্না গান্ধী মহারাজকা হুকুম নেহি হ্যায়, সাহেব!' খড়ি বল্লে,—'That Gandhi chap has become a great nuisance'—অর্থাৎ সেই গান্ধীটা এক মহা আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।—এই শুনেই রাগে আমি আর থাকৃতে পারলাম না। তাদের সমুখে গিয়ে বল্লাম—অবশ্য ইংরেজীতে—'খড়ি, এ কি কথা বল্ছ তুমি?' ছোঁড়াটা ত আমাকে দেখেই স'রে পড়ল। খড়ি কি উত্তর দেবে, খানিকক্ষণ ভেবে পেলে না। তার পর হেসে বল্লে—'ওটা আমি ঠাট্টা ক'রে বলেছি বৈ ত নয়!'—আমি তাকে কপট, মিথ্যাবাদিনী এই সব ব'লে তিরস্কার ক'রে, তার মুখের উপর স্পষ্ট ব'লে এসেছি মা—এ মুহূর্ত্ত থেকে তোমার সঙ্গে আর কোনও সম্বন্ধ আমার রইল না—যে মুখে তুমি মহাত্মাকে অপমান করেছ, সে মুখ আমি আর দেখতে চাই নে।"

আমি বলিলাম, "তা বেশ করেছ বাবা। ও-সব পাহাড়ী মেয়ে, ওদের কি কোনও নীতিজ্ঞান আছে? তোমাকে মদ, ও সিগারেট খাওয়া বন্ধ করেছে, অথচ লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে ছাড়তো না, এ আমি নিজের চক্ষে দেখেছি বাবা, খুকীও দেখেছে।"

"খেত না কি মা? কবে দেখেছ তুমি?"

জানি কবে এবং কোথায় উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা সুধাকে বলিলাম। শুনিয়া সে বলিল, "তাই না কি? কি ঘোর মিথ্যাবাদিনী! অথচ আজ বিকেলেই সে আমাকে বলেছে, 'যে দিন থেকে তুমি মানা করেছ, সে দিন থেকে সিগারেট আমি স্পর্শ করিনি—সিগারেটের উপর আমার ভয়ানক ঘৃণা জন্মে গেছে'।"

মাতা-পুত্রে উভয়েই প্রায় পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম, "রাত হ'ল, এবার খাবে চল বাবা। ও-সব চিন্তা মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেল।"

সুধা বলিল, "খাব মা, কিন্তু আজ আমি আলাদা থালায় খাব না। তোমার পাতের প্রসাদ খেয়ে, তোমাদের মনে দুঃখ দিয়ে যে পাপ করেছি আমি, সে পাপ থেকে আমি মুক্ত হব।"

"আচ্ছা, তাই হবে। দু'জনকার লুচিই এক থালায় দিতে বলি। তুমি ততক্ষণ কাপড়-চোপড় বদ্‌লে নাও।" বলিয়া আমি বাহির হইলাম।

দুয়ার খুলিয়াই দেখি, খুকী দাঁড়াইয়া ছিল, সরিয়া গেল। হলে গিয়া খুকী আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সব কথা শুনেছি মা! বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে—ধাড় হতচ্ছাড়ী উননমুখী বাঁদরী—তুই নিমতলার ঘাটে যা—নিমতলার ঘাটে যা—তুই মর্‌ মর্‌ মর্‌!" বলিয়া সে মট্‌-মট্‌ করিয়া আপন আঙুল মট্‌কাইতে লাগিল।

"ছি মা, কাউকে কি মর্‌ মর্‌ বলতে আছে? সবাই সেই ভগবানের ছেলে-মেয়ে! রাত হয়েছে, যাও, তুমি এখন শুয়ে পড় গে।"—বলিয়া আমি রান্না-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

রাত্রে সুসংবাদটা শুনাইলে উনি বলিলেন, "আমি জানি, আমার ছেলে, অমন দুর্ব্বুদ্ধি তার বেশী দিন থাকবে না!"

দেখ একবার অবিচার! ওঁর ছেলে বলিয়াই নিজ বাহুবলে সে যেন জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারিয়াছে! আর আমি মাগী যে মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে কত মাথা খুঁড়িয়া, কত পূজা মানিয়া ছেলের মন ফিরাইলাম, সে কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসিল না!

একালের ছেলে

১

আমি পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ, আমার নাম শ্রীকরালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খিজিরপুর। আমার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র, তখনই আমার পিতা স্বগ্রামনিবাসী ৺রেবতীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দেবী ওরফে রাজুর সহিত আমার বিবাহ দেন। রাজুর বয়স তখন আট বৎসর—আমার শ্বশুর-মহাশয় গৌরীদান করিয়া, আশা করি পরলোকে তাঁহার পুণ্যোচিত পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত হন নাই। শ্বশুর-মহাশয়ের কোনও পুত্রও ছিল না, সুতরাং তাঁহার স্বর্গারোহণে তাঁহার বাসগৃহ, পুষ্করিণী, আমবাগান এবং প্রায় পঞ্চাশ বিঘা লাখেরাজ জমি আমি প্রাপ্ত হই এবং এতাবৎ কাল ভোগদখল করিতেছি। আমার পিতাও নিঃস্ব ছিলেন না, পিতা ও শ্বশুরের মিলিত সম্পত্তির উপস্বত্বে, তাঁহাদের মিলিত আশীর্ব্বাদে, আমি পল্লীগ্রামের পক্ষে, স্বচ্ছল অবস্থাতেই জীবন যাপন করিতেছি।

আমি ক্রমে ক্রমে দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা লাভ করি, ঈশ্বরেচ্ছায় সকলগুলিই জীবিত আছে। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম প্রফুল্ল-কুমার, গ্রামের ইস্কুলে সে মাইনর পাস করিলে, বর্দ্ধমানে তাহাকে

এক আত্মীয়ের বাসায় রাখিয়া রাজস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিই। তথা হইতে সে ম্যাট্রিক পাস করিয়া মাসিক দশ টাকা জলপানি পায়। আই-এ পড়িবার জন্ত কলিকাতা যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অত দূরদেশে ছেলে পাঠাইতে গৃহিণীর মত হইল না। শরীর আছে, অশরীর আছে, দায় আছে, বিপদ আছে তার চেয়ে বর্দ্ধমানই ভাল, তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছান যায়। আমার সে আত্মীয়টী ছিলেন সরকারী কর্ম্মচারী। সে সময় তিনি বর্দ্ধমান হইতে বদলী হইয়া গেলেন, সুতরাং ছেলেকে রাজকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া ষ্টুডেণ্ট্ মেস অথবা ছাত্রাবাসে তাহাকে স্থাপন করিয়া আসিলাম। এই ছাত্রাবাসটী মহাজনটুলীতে অবস্থিত।

গত বৎসর ফাল্গুন মাসে কামারহাটী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তা শ্রীমতী ঊষাবালার সহিত প্রফুল্লকুমারের বিবাহ দিয়াছি। বৈদ্যনাথের সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল নহে, কিছুই দিতে পারেন নাই। গৃহিণীর তাহাতে খুবই আপত্তি ছিল, কিন্তু মেয়েটী ভারি সুন্দরী দেখিয়া আমি সেদিকে বিষম ঝুঁকিয়া পড়ি। ঠিকুজী-কোষ্ঠীতেও রাজযোটক দেখা গিয়াছিল। উহারা বলিয়াছিল মেয়ের বয়স এগারো, কিন্তু গৃহিণী বলিয়াছিলেন, "কখ্খনো নয়। তেরোর একদিন কম যদি হয় ত আমার নাক কাণ কেটে দিও।"—আমার গৃহিণীটি কিঞ্চিৎ মুখরা।

আমার দ্বিতীয় পুত্রটির বয়স দশ বৎসর মাত্র। তাহার

নাম হরেন্দ্রনাথ, সে গ্রামস্থ মাইনর ইস্কুলে পাঠ করে। কন্যা তিনটী যথাযোগ্য ঘর-বরে বিবাহ দিয়াছি, তাহারা এখন ছেলে-পুলের মা হইয়াছে, নিজ নিজ সংসার করিতেছে।

মহালয়ার দিন প্রফুল্লকুমার বাড়ী আসিল। ষ্টেশনে গোযান পাঠাইয়াছিলাম, হরেন সেই গো-যানে তার দাদাকে আনিতে ষ্টেশনে গিয়াছিল। ইহা আমার নিজস্ব গো-যান। এখানে আসিতে হইলে মেমারি ষ্টেশনে নামিতে হয়, মেমারি এখান হইতে সাত ক্রোশ ব্যবধান।

পরদিন এক প্রহর বেলা থাকিতে কামারহাটী হইতে প্রফুল্ল-কুমারের পূজার তত্ত্ব আসিতে দেখিয়া আমার বুক দুরদুর্ করিয়া উঠিল। না জানি কিরূপ তত্ত্ব বেহাই পাঠাইয়াছেন এবং সে তত্ত্ব গৃহিণীর পছন্দ হইবে কিনা। তত্ত্ব পছন্দ না হইলে গৃহিণী রাগিয়া "কুরুক্ষেত্র" করিবেন, এ আশঙ্কা আমার মনে ছিল। গত জামাই-ষষ্ঠীর সময় ইহার সূচনা পাইয়াছিলাম। ছেলের তখন গ্রীষ্মের ছুটী, বাড়ীতে রহিয়াছে। বেহাই স্বয়ং আসিয়া তাঁহার জামাতাকে লইয়া গেলেন। সপ্তাহ পরে ছেলে শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিল। আমি তখন বাড়ীর ভিতরেই ছিলাম, দিবানিদ্রান্তে উঠিয়া তামাক খাইতেছিলাম। ছেলে হাত-পা ধুইয়া জল খাইয়া ঠাণ্ডা হইলে গৃহিণী বলিলেন, "ওরা কি কি দিলে, দেখি ?"

প্রফুল্ল তোরঙ্গ খুলিয়া বলিল, "এই ধুতি-চাদর দিয়েছেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "জুতো ?"

"না, জুতো দেন নি।"

"সিল্কের জামা-টামা ?"

"না, সিল্কের জামা দেন নি। বল্লেন, বাবাজী, জুতো-জামা এ পাড়াগাঁয়ে ত পাওয়া যায় না, এক কল্‌কাতা থেকে আনানো। তা আন্দাজি আনালে মাপে ছোট হবে কি বড় হবে তার ত ঠিক নেই। সেইজন্তে আর—"

গৃহিণী পুত্রকে ভেঙাইয়া বলিলেন, "সেই জন্তে আর সে ব্যবস্থা করেন নি! তা বেশ ত, তোর হাতে দু'খানা দশটাকার নোট দিয়ে বল্লেন না কেন, বাবাজী, ছুটীর পর বর্দ্ধমানে গিয়ে জুতো-জামা কিনে নিও ?"

প্রফুল্ল নির্ব্বাক্ হইয়া নতমুখে চোরটির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রোধে গৃহিণীর চক্ষু লাল। কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া বলিলেন, "বল্। আমার কথার জবাব দে!"

ছেলেরই যেন অপরাধ! গৃহিণী তখন ধুতি-চাদর হস্তে লইয়া, তাহার জমি পরীক্ষা করিয়া, আমার গায়ের উপর উহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ একবার তোমার পেয়ারের বেয়াইয়ের আক্কেল-খানা। ধুতির জমিটা একবার দেখ। মোটা ক্যাট্‌-ক্যাট্ করছে। এই ধুতি মানুষ জামাইকে দেয় ?"

আমি হুঁকা নামাইয়া বস্ত্র পরীক্ষা করিয়া বলিলাম, "কেন, জমি মন্দই বা কি ? সুতো মোটা নয়, বেশী থাপি জমি তাই মোটা দেখাচ্ছে। ঢ়'দিন টিক্‌বে।"

গৃহিণী আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "নাঃ, সুতো মোটা নয়! চোখে ধরেছে চাল্‌শে, নজ্ন কি মোটা দেখ্‌তে

পাচ্ছ, না ছাই পাচ্ছ। চশমা চোখে দিয়ে, একবার দেখ দেখি।”

আমি বলিলাম, “গাঁয়ের তাঁতিদের বোনা কাপড় ত! বেশী মিহি সূতো তারা পাবে কোথা বল? সে ছোট পাড়া-গাঁ—করাসডাঙ্গা, শান্তিপুরের কাপড়-চোপড় সেখানে কি কিন্‌তে পাওয়া যায়?”

গৃহিণী চক্ষু রাঙাইয়া বলিলেন, “বেয়াইয়ের হ’য়ে তুমি ওকালতী কোরো না খবর্দার বল্‌ছি।” ছেলেকে বলিলেন, “তোর আর এ ধুতি-চাদর প’রে কায নেই। এ তুলে রেখে দিই, পূজোর সময় ঠাকুর-মশাইয়ের ছেলেকে দিলেই হবে।”—

পুরোহিত-মহাশয়, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানকে আমি পূজায় প্রতি বৎসর বস্ত্রাদি দিয়া থাকি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই সকল ঘটনা স্মরণ করিয়াই আমি আশঙ্কায় আকুল হইলাম। একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি তত্ত্ব বহিয়া আনিয়াছে। সে ব্যক্তি আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া একখানি পত্র দিল। তাহার পরিচয় লইলাম—নাম গোবর্দ্ধন, জাতিতে সদ্গোপ, বৈবাহিক-মহাশয়ের অনুগত লোক, তাঁহার জমি চাষ করে। দ্রব্যাদিসহ লোকটিকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া, আমি পত্র পড়িলাম। বৈবাহিক মহাশয় তত্ত্ব-সামগ্রীর দৈন্য ও অপ্রচুরতা জন্ত অনেক বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। অবশেষে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, প্রেরিত লোকটির সহিত প্রফুল্লকুমার বাবাজীবনকে যেন কয়েক দিনের জন্ত পাঠাইয়া দিই।

অল্পক্ষণ পরেই ঝি আসিয়া বলিল, "মা ডাক্‌ছেন।"

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখি, যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। গৃহিণী, উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তি। তত্ত্ব-সামগ্রী বারান্দাময় ছড়ানো—পরে শুনিয়াছিলাম, তিনি সেগুলি, লাথাইয়া লাথাইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমাকে দেখিবামাত্র ঝঙ্কার দিয়া তিনি যে সব কথা বলিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আর কায নাই। যে লোকটি তত্ত্ব আনিয়াছিল, সে বারান্দার কোণে বসিয়া হাঁটুর ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। গৃহিণী তাহাকে বলিতেছেন, "ওঠ্‌, বেটা নচ্ছার পাজি চাষা, তোল্‌ এ-সব জিনিষ তোর তোরঙ্গে, ফিরিয়ে নিয়ে যা—এ-সব আমি চাইনে।"

আমি গৃহিণীকে বলিলাম, "ছি ছি কি কর্‌ছ পাগলামী ?" বলিয়া জিনিষগুলি আমি কুড়াইয়া কুড়াইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিলাম।

কত কষ্টে কত সাধ্য-সাধনায় তাঁকে ঠাণ্ডা করিলাম তাহার বিস্তারিত বিবরণে আর প্রয়োজন নাই। জিনিষগুলি তিনি রাখিলেন, কিন্তু ছেলেকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। অধিকন্তু তাহাকে বলিলেন, "খবর্দ্দার সে ছুঁড়ীয়ের কখনও মুখ দেখবি ত মাতৃহত্যের পাতক হবি। এগ্‌জামিনটে হয়ে যাক, এবার কোনও ভদ্দর-লোকের মেয়ে এনে তোর বিয়ে দেবো। সে বউ ত্যাগ করলাম আমি।"

গৃহিণীকে বলিলাম, "অনেক পথ হেঁটে এসেছে, লোকটাকে জল-টল খাবার দাও।" তাহাকে বলিলাম "তুই বাবা আজ

এখানে থেকে বিশ্রাম কর্। কাল ভোরে উঠে তখন যাস্।”—বলিয়া আমি বৈঠকখানায় চলিয়া গেলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, লোকটি বাহির হইয়া আসিতেছে। আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, “বাবা-ঠাকুর, আমি চল্লাম।”

আমি বলিলাম, “এখনি চল্লি? খাওয়া-দাওয়া হ’ল না। খাওয়া-দাওয়া ক’রে এখানে ঘুমিয়ে কাল সকালে গেলে হ’ত না?”

সে বলিল, “কাল সকালেই রওয়ানা হব বাবা-ঠাকুর। এ-গাঁয়ে আমার একঘর কুটুম আছে, তাদের সঙ্গে দেখা-শুনো করাও দরকার, রাতটে সেইখানেই থাকবো।”

“সেইখানে থাক্‌বি? আচ্ছা তা বেশ। বোস্ তাহ’লে একটু। বেয়াই-মশাইকে চিঠি একখানা লিখে দিই। ঐখানে তামাক-টিকে সব আছে, তামাক সাজ্।”

গোবর্দ্ধন তামাক সাজিতে বসিল। আমি বেহাইকে পত্র লিখিলাম। লিখিলাম, “আপনার প্রেরিত উপহার দ্রব্যগুলি পাইয়া আমরা সকলে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আপনার সাদর আহ্বানে প্রফুল্ল বাবাজীবনকে এই সঙ্গে পাঠাইতাম, কিন্তু পরীক্ষার আর বেশী বিলম্ব না থাকায়, বাবাজীবন এখন পড়াশুনা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত। এখন সেখানে গেলে বৃথা কয়েকদিন সময় নষ্ট হইবে। পরীক্ষাটা হইয়া যাক্, আপনার জামাই আপনারই রহিল, বাবাজীর এখন যাওয়া হইল না বলিয়া আপনি বা বেয়ান-ঠাকুরাণী যেন দুঃখিত না হন ইহাই আমার প্রার্থনা।

বধূমাতার জন্ত সামান্ত কিঞ্চিৎ উপহার যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আগামী পঞ্চমীর দিন তাহা পাঠাইব। দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া তাহা গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।”—ইত্যাদি।

পত্র লেখা শেষ করিয়া, গোবর্দ্ধনকে নিকটে ডাকিয়া তাহার হাতে পত্রখানি দিয়া বলিলাম, “বাবা গোবর্দ্ধন, এই চিঠিখানি বেয়াইকে দিবি। আর, আমার একটি কথা তোকে রাখতে হবে, বাবা!”

“কি কথা কর্ত্তা-মশাই?”

“এখানে যা দেখলি শুনলি—এই, রাগের মাথায় গিন্নী যা বলেছেন করেছেন, সে সব আর সেখানে প্রকাশ করিস্‌নে বাবা! কুটুম্বিতা হলে এ সব আকছার হয়েই থাকে, কোন্ সংসারে না হয়? কিন্তু জানতে পারলে বেয়াই বেয়ান মনে বড়ই কষ্ট পাবেন। এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও সেখানে প্রকাশ করিস্‌নে লক্ষ্মী বাপ্ আমার! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তোকে আশীর্ব্বাদ করছি, তোর ভাল হবে। আমি চিঠিতে লিখে দিলাম যে জিনিষপত্তর তিনি যা পাঠিয়েছেন তা পেয়ে আমরা খুব খুসী হয়েচি। বুঝ্‌লি ত? তুইও সেই রকম বল্‌বি। আর এই নে, ছ'টি টাকা, কা'ল যাবার সময় পথে জলটল খাবি।”—বলিয়া তাহার হাতে ছ'টি টাকা দিলাম।

গোবর্দ্ধন হাত যোড় করিয়া বলিল, “আজ্ঞে কর্ত্তা যখন নিষেধ করলেন, তখন এ সব কথা আমি চেপে যাব বৈকি। ছিছি, এ সব কি পেরকাশ করবার কথা?” টাকা ছ'টি টেঁকে

শুঁজিতে শুঁজিতে বলিল, "কিন্তু মাঠাকরুণ ঐ যে বল্লেন ছেলের আবার বিয়ে দেবেন সেটা বাবাঠাকুর ?"—বলিলাম, "না রে না। ওটা রাগের মাথায় বলেছেন বৈত নয়। ওকি একটা কথা হল ? ও-সব কথা কিছু তুই প্রকাশ করিস্‌নে।"

গোবর্দ্ধন স্বীকৃত হইল। বলিলাম, "দেখিস্ বাবা ! ব্রাহ্মণের কাছে কথা দিয়ে যেন কথার খেলাপ করিস্‌নে।"

"না বাবা ঠাকুর, কথার খেলাপ হবে না।"—বলিয়া সে আমার পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিল।

কয়েক দিনই লক্ষ্য করিলাম, ছেলেটার মনে সুখ নাই, মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বেড়ায়। তার গর্ভধারিণীর আচরণে মনে সে ব্যথা পাইয়াছে। তাহাও বটে,—এবং সেই জামাই-ষষ্ঠীর সময় গিয়াছিল, পূজার ছুটীতেও শ্বশুর-বাড়ী যাইবে আশা করিয়াছিল, তাহার সে আশা ভঙ্গ হওয়াতেও বোধ হয় সে মনঃক্ষুণ্ণ। এখনই না হয় বুড়া হইয়াছি, কিন্তু যে বয়সের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, যে সাধ-আহ্লাদ, তাহাও ত জানি ! ফাল্গুন মাসে উহার পরীক্ষা। মাঘ মাস গেলেই বিবাহের এক বৎসর পূর্ণ হইয়া যাইবে, ছেলে বাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই বৌমাকে আনাইয়া রাখিব।

দেখিতে দেখিতে মহাপূজা আসিয়া পড়িল। উৎসবের হাওয়ায়, বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য্যে ছেলের মুখখানিও আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

২

ছুটি ফুরাইলে বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া প্রফুল্ল বর্দ্ধমানে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বলিল, এবার বড়-দিনের ছুটিতে আর বাড়ী আসিবে না, কারণ, তখন পরীক্ষা অত্যন্ত সন্নিকট—পড়া-শুনা লইয়া তাহাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইবে। পরীক্ষা শেষ হইলে, একেবারে ফাল্গুন মাসে আসিবে। গৃহিণী বলিলেন, "চা—র মা—স। চার মাস বাদে বাড়ী আস্‌বি? মাঝে একটা ছুটি-ছাটাতে দু'তিন দিনের জন্যেও এসে দেখা দিয়ে যেতে পার্‌বি নে?"

প্রফুল্ল বলিল, "ছুটি-ছাটা তেমন আর কৈ?"

"কেন জগদ্ধাত্রী পূজোর ছুটি, তবে গিয়ে সরস্বতী পূজোর ছুটি।"

"জগদ্ধাত্রী পূজোর দু'দিন ছুটি আছে বটে, সঙ্গে একটা রবিবারও পড়েছে। কিন্তু তিন দিনের জন্যে আসতে গেলে সাতটি দিন পড়াশুনোর ক্ষতি। আগে দু'দিন কতক্ষণে বাড়ী যাব কতক্ষণে বাড়ী যাব এই ক'রে ক'রে পড়ায় মন বস্‌বে না। ফিরে গিয়েও, পড়ায় মন বসাতে দু'দিন লেগে যাবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "সারা বছরই ত মেহনত করলি বাবা, এক হপ্তায় আর কি এসে যাবে? তাতে কি আর পাস হওয়া আটকাবে?"

ছেলে বলিল, "পাস হওয়া না আটকাতে পারে। কিন্তু শুধু পাস হলেই ত চল্‌বে না মা। গতবারে যেমন জলপানিটি পেয়েছিলাম, এবারও যাতে সেই রকম পেতে পারি সেই চেষ্টাই করছি কিনা।"

পড়াশুনায় প্রফুল্লর বরাবরই খুব আঁঠা।—অন্য ছেলেদের যেমন "ওরে পড়্‌রে ওরে পড়্‌রে" বলিয়া তাগাদা করিতে হয়, প্রফুল্লকে কোনও দিন সেরূপ করিতে হয় নাই। ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ—ছেলে আমার সে তপস্যায় কোনও দিন অবহেলা করে নাই। তাই আমি বলিলাম, "প্রফুল্ল যা বলছে তা ঠিক কথাই। আচ্ছা বাবা, পরীক্ষা হয়ে গেলেই তুমি এস। তোমার পড়ার বিঘ্ন আমরা করতে চাই না।"

ঘট প্রণাম করিয়া, আমাদিগকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্ল শুভযাত্রা করিল।

প্রফুল্ল প্রতি রবিবার আমাকে একখানি করিয়া পত্র লেখে, সে পত্র আমি পাই সোমবার বেলা তিনটার সময়। শুক্রবারে জগদ্ধাত্রী পূজা ছিল, শনিবার মা'র বিসর্জ্জন, রবিবার প্রাতে গৃহিণী বলিলেন, রাত্রে প্রফুল্ল-সম্বন্ধে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মন বড় খারাপ হইয়াছে। আমি বলিলাম, "জগদ্ধাত্রী পুজোর ছুটিতে ফি-বছরই ছেলে বাড়ী আসে, এবার আসেনি ব'লে আমার মনটাও খারাপ ছিল। তোমারও ছিল নিশ্চয়। সেই জন্যেই ও রকম স্বপ্ন দেখেছ—ও কিছু নয়, সে ভালই আছে, কোনও চিন্তা নেই।"

গৃহিণী বলিলেন, "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তাই যেন হয়। কিন্তু তবু, তুমি গিয়ে একবার তাকে দেখে এস।"

বলিলাম, "আজ রবিবার, আমি বর্দ্ধমানে গিয়ে ছেলেকে দেখে ফিরে আস্‌তে কাল বেলা দুপুরের কম ত নয়,—কাল সোমবার বেলা তিনটের সময় তার চিঠিই ত আস্‌বে।"

সমস্ত দিন গৃহিণীর মনটি বিষণ্ণ হইয়া রহিল। সোমবার আহারাদি সারিতে বেলা একটা বাজিল। তামাক খাইয়া গৃহিণীকে বলিলাম, "আমি যাই পোষ্ট আপিসে গিয়ে ছেলের চিঠি নিয়ে আসি। বেলা দেড়টার সময় রাণার ডাক আনে, তবু দেড় ঘণ্টা আগে চিঠিখানা পাব।" বলিয়া আমি বাহির হইলাম। গ্রামেই পোষ্ট আফিস আছে।

ডাকবাবু সমাদর করিয়া আমায় আপিস-ঘরে ডাকিয়া বসাইলেন। দেড়টা তখন বাজিয়া গিয়াছিল। শুনিলাম রাণার এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। দুইটা বাজিতে চলিল, তখনও রাণারের দেখা নাই। ডাকবাবু বলিলেন, "ট্রেণ লেট্ থাক্‌লে একটু দেরীও হয়।"

ঠিক যখন সওয়া দুইটা, তখন বাহিরে রাণার আসিবার ঝম্-ঝম্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ডাক আসিল, ডাকবাবু ব্যাগ কাটিলেন। ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কৈ না, আপনার কোনও চিঠি ত নেই।"

ভগ্নমনে গৃহে ফিরিলাম। চিঠি আসে নাই শুনিয়া গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার চোখ মুছাইয়া বলিলাম, "ছি ছি,

চোখের জল ফেলতে আছে ? তাতে যে ছেলের অকল্যাণ হবে। আমি এখনই বর্দ্ধমান রওয়ানা হচ্ছি। সন্ধ্যা নাগাদ সেখানে পৌঁছুব। আজ রাত্রের মধ্যেই ছেলের ভাল খবরটা তোমায় এনে দেবো। তুমি ধৈর্য্য ধর, আর ঠাকুরদের ডাক,—তাঁরা সমস্তই মঙ্গল করবেন।”—বলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

এক ঘণ্টার মধ্যেই গরুর গাড়ীতে মেমারি যাত্রা করিলাম। বর্দ্ধমানে মহাজনটুলীতে ছেলের বাসায় যখন পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা সাতটা।

ঘর সব খালি। “প্রফুল্ল” বলিয়া ডাকিতে, একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল, সে আমার পরিচিত, আমাদের পাশের গ্রামেই বাস। তার নাম সুরেন্দ্র, বাল্যকাল হইতে প্রফুল্লর বিশেষ বন্ধু। আমাকে সে জ্যেঠামশাই বলিয়া ডাকে। আমাকে দেখিয়াই, “জ্যেঠামশাই যে!” বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল। বলিলাম, “ভাল আছ ত বাবা? প্রফুল্ল কৈ? সে কেমন আছে?”

সুরেন বলিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি। প্রফুল্লও ভাল আছে।”

“কৈ সে?”

সুরেন বলিল, “আজ্ঞে সে ত এখন বাসায় নেই।”

“কোথা গেল? কখন আসবে?”

সুরেন বলিল, “আজ্ঞে সে—সে—কি একটা গ্রামে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বক্তির—”

"বক্তির ? বক্তির গেছে কেন ?"

"আজ্ঞে সেখানে, আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের বিয়ে কিনা। সেই জন্যে গেছে। কালই রওয়ানা হয়েছে।"

"ফিরবে কখন ?"

"কাল বোধ হয় ফিরবে, এসে কলেজ করবে। নয় ত বড় জোর পরশু। তবে বৌভাতটা না হয়ে গেলে তারা যদি না ছাড়ে, তবে দুই-একদিন দেরীও হতে পারে। পার্সেন্টেজ তার যথেষ্ট আছে, দুই-একদিন দেরীতে কোনও ক্ষতি হবে না। আসুন না জ্যেঠামশাই, আমার ঘরে এসে বসুন।" বলিয়া আমাকে হাত ধরিয়া তাহার ঘরে লইয়া গেল।

আমায় বসাইয়া বলিল, "ঐ বিয়েতে আমারও নেমন্তন্ন ছিল, আমাকেও ধরেছিল যাবার জন্যে। আমি অনেক কষ্টে কাটিয়ে দিয়েছি, প্রফুল্ল আর কাটাতে পারলে না। আমার চেয়ে প্রফুল্লর সঙ্গেই তার বেশী ভাব কিনা! প্রফুল্লর বিয়েতে সে ত আপনার বাড়ীতে গিয়েছিল, স্মরণ নেই বোধ হয়? রোগা ছিপ্ ছিপে, কালো, বাঁ-গালে একটি আঁচিল আছে।"

আমি বলিলাম, "কৈ বাবা আমার মনে পড়ছে না। তোমাদের আট-দশ জন বন্ধু গিয়েছিল, বিশেষ, আমি তখন ভারি ব্যস্ত—অত স্মরণ হচ্চে না।"

সুরেন বলিল, "আজ্ঞে তা তো বটেই! তা হঠাৎ যে জ্যেঠামশাই ? সহরে কোনও কায ছিল বুঝি ?"

কি কাযে আসিয়াছি তাহা সুরেনকে খুলিয়াই বলিলাম। শুনিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ প্রফুল্ল সকালে বল্‌ছিল বটে যে কাল পোষ্ট কার্ড কিনে রাখ্‌তে ভুলে গেলাম, আজ রবিবার, বাবাকে চিঠি লিখি কি ক'রে ? একদিন দেরীই হয়ে গেল, কাল পারি ত বস্তির থেকেই চিঠি লিখবো এখন। জ্যেঠাইমা যখন অত উতলা হয়েছেন, তা হ'লে জ্যেঠামশাই, আর আপনার এখানে দেরী করা উচিত নয়। জ্যেঠাইমা সেখানে ভেবে খুন হচ্ছেন, আপনি তা হ'লে সাতটা বাইশ মিনিটের গাড়ীতে রওয়ানা হোন্।

বলিলাম, "হ্যাঁ বাবা, তাইতে রওনা হব মনে করেই এসেছি। বেথারিতে আমার গরুর গাড়ী অপেক্ষা করছে।"

"তাই ত! আপনাকে জল-টলও কিছু খাওয়াতে পারলাম না! বাড়ী পৌঁছতে বোধ হয় রাত দুপুর হ'বে ?"

"রাত এগারোটা ত বটেই। ইষ্টিশানে গিয়ে কিছু মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে খেয়ে নেবো এখন, সে জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না বাবা। আচ্ছা, এখন তা হ'লে উঠি। বস্তিরে সেই গোলমালে যে প্রফুল্ল চিঠি লিখ্‌তে পারবে, সে আশা কম। সে ফিরে এলেই—কালই আসুক বা দু'দিন পরেই আসুক—পৌঁছেই যেন একখানা চিঠি আমায় লিখে দেয়।" বলিয়া আমি উঠিলাম।

সুরেনও আমার সঙ্গে ষ্টেশনে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অনর্থক সময় নষ্ট করিতে তাহাকে মানা করিয়া আমি প্রস্থান করিলাম।

রাত্রি বারোটায় বাড়ী পৌঁছিয়া গিন্নীকে সুখবরটী দিতে তবে তিনি শান্ত হইলেন।

বৃহস্পতিবারের দিন প্রফুল্লর চিঠি আসিল। বর্দ্ধমান হইতেই লিখিয়াছে। বৌভাত পর্য্যন্ত উঁহারা তাহাকে কিছুতেই আসিতে দেয় নাই। পোষ্টকার্ড কিনিয়া রাখিতে নিজ ভুলের জন্য আমরা এত কষ্ট পাইয়াছি, এ জন্য অনেক দুঃখ করিয়াছে।

৩

প্রতি সোমবারে নিয়মিতভাবে প্রফুল্লর পত্র আসিতে লাগিল।

পৌষ-তত্ত্বের পূর্ব্বে, গৃহিণীকে লুকাইয়া, বেহাই-মহাশয়কে আমি রেজিষ্ট্রি করিয়া দুই শত টাকা পাঠাইয়া দিলাম। লিখিয়া দিলাম, আজকাল যে নূতন ফ্যাসানের দোরোকা শাল উঠিয়াছে, তাহাই গায়ে দিতে তাঁহার জামাতার অত্যন্ত সখ। তিনি যেন স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া ভাল শাল একখানি কিনিয়া আনেন, আর ষোল গিরা একটি কাশ্মীরা কোট, গরম গেঞ্জি, গরম মোজা প্রভৃতি। আমি কিঞ্চিৎ টাকা পাঠাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলাম বলিয়া তিনি যেন কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হন; তাঁহার কিরূপ অনটনের সংসার তাহা আমি অবগত আছি বলিয়াই, কুটুম্ব হিসাবে নয়, বন্ধুভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিলাম, ইহাতে তিনি যেন আমার অপরাধ না লয়েন এবং কথাটা গোপন রাখেন ইত্যাদি।

গৌরের জন্ম দেখিয়া গৃহিণী খুশী হইলেন। বলিলেন, "আহা, ছেলে যদি বাড়ী থাকতো, তবে বড় আনন্দ হতো।"

বলিলাম, "দু'মাস পরেই ত সে আসছে। এলে দেখবে এখন।"

গৃহিণী ধরিলেন, "না গো তুমি একবার যাও বর্দ্ধমান। ছেলেকে এ সব দিয়ে এস। সে তার বন্ধুবান্ধবকে দেখাবে, কত আমোদ হবে তার।"

নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় গৃহিণীর অনুরোধ পালন করিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইল। জিনিষগুলি লইয়া একদিন আহারাদির পর রওয়ানা হইলাম। ছেলেকে দেখিয়াও আসিলাম, জিনিষ-গুলি দিয়াও আসিলাম। শুনিলাম বাইশে ফাল্গুন তাহার পরীক্ষা শেষ হইবে, তেইশে সে বাড়ী যাইবে।

গৃহে ফিরিয়া পাঁজি দেখিলাম, বাইশে ফাল্গুনের পূর্ব্বে দ্বিরাগমনের ভাল দিন নাই। সেই অনুসারে বেহাই-মহাশয়কে পত্র লিখিলাম।

বাইশে ফাল্গুন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেহাই নিজে আসিয়া তাঁহার মেয়েকে ঘর-বসত করিবার জন্য রাখিয়া গেলেন। বিবাহের সময় মা'র আমার যেমন রূপ দেখিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার দ্বিগুণ হইয়াছে। ঘর আলো-করা পুত্রবধূ যদি কাহারও আবশ্যক হয়, তবে সে যেন পুত্রের জন্য এমন পাত্রীরই সন্ধান করে।

পরদিন আমি স্নান করিবার জন্য বাড়ীর ভিতর গিয়া

দেখিলাম, গৃহিণীর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। আমার সম্মুখে আসিয় দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ লাল, চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতেছে, কণ্ঠস্ব অবরুদ্ধ। বলিলেন, "ওগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, কি হয়েছে?"

তিনি বলিলেন, "বউমা নিজের ত মাথা খেয়েইছে, আমাদেরও মাথাও খেয়েছে।"

"কেন, কি করেছেন বউমা?"

গৃহিণী আমার কাণে-কাণে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিলেন

আমি বলিলাম, "মাথা খেয়েছে কেন বল্‌ছ? কেন ক'মাস? প্রফুল্ল কি মাসে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিল? হ্যাঁ, জ মাসে। তা হ'লে—তুমি কি বল্‌ছ—"

মাথামুণ্ড কি বলিব, কথা শেষ করিতে পারিলাম না শঙ্কাকুল নয়নে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া রহিলাম।

গৃহিণী বলিলেন, "তা হ'লে ত ভরাভর্ত্তিই হত—খালাস হবা সময় ঘনিয়ে এসেছিল। তা নয়। চার মাস কি বড় জো পাঁচ মাস।"

আমি নিজ কপাল টিপিয়া ধরিয়া, চক্ষু মুদিয়া নারায়ণ স্মর করিলাম। একটু সামলাইয়া লইয়া, মুখ তুলিয়া বলিলাম "তোমার ভুল হয় নি ত?"

গৃহিণী বলিলেন, "শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমি পাঁচ-পাঁচট সন্তানের মা, তিনটে মেয়ে আমার কাছে থেকে খালাস হ'ল,— আমারই ত ভুল হবে! সে যাক্‌, বউমাও ত অস্বীকার কর্‌ে

না। এ সর্বনাশ কে করলে জিজ্ঞাসা করলে কোনও উত্তর দিচ্ছে না। খালি কাঁদছে। এখন বউ নিয়ে কি করবে কর। ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর।"

আমার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আহা, মেয়েটাকে আপন সন্তানের মতই ভাল বাসিয়াছিলাম। আমার এ কি শাস্তি দিলে, ভগবান? চক্ষু মুছিয়া বলিলাম, "আহা, ওর দোষ কি, দুধের বাছা! দোষ ওর বাপ মা'র— যারা এমন অসাবধান। ঝাঁটা মারা উচিত তাদেরই মাথায়।"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, অসাবধান! জেনে শুনেই তারা এমনটা ঘটতে দিয়েছে। গোড়া থেকেই আমি তোমায় বলিনি, ও ছোট-লোকের মেয়েকে ঘরে এন না। তুমি কি আমার কথা তখন শুনলে? বউয়ের রূপ দেখে একেবারে গ'লে গেলে। এখন রূপ ধুয়ে ধুয়ে খাও। ছোটলোক—ছোটলোক! মেয়ের রোজগার খাচ্ছিল, বুঝতে পারছ না? নইলে পৌষের তত্ত্বে অত টাকা খরচ করলে কোথা থেকে? উদ্ খেতে ক্ষুদ নেই যার, সে জামাইকে দেড়শো টাকা দামের শাল দিতে পারে? পূজোর-তত্ত্বও ত দেখেছিলে!"

দেড়শো টাকা দামের শাল কোথা হইতে আসিল, অন্য অবস্থা হইলে আমি এখনই তাহা প্রকাশ করিতাম। কিন্তু প্রকাশ করিয়া ত কণামাত্র ফল নাই! জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাড়ীর আর কেউ এ কথা জানতে পেরেছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "না, বোধ হয় না!"

বলিলাম, "তা হ'লে খুব সাবধান, কেউ কিছু যেন জানতে না পারে। আমি নিজে গিয়ে বউমাকে তার বাপের বাড়ী রেখে আসবো এখন।"

"রেখে এস, কিন্তু আজই। আজ তেইশে ফাল্গুন, আজ রাতেই ছেলে বাড়ী এসে পৌঁছবে মনে আছে ত?"

"হ্যাঁ, তা তো মনে আছে। আচ্ছা, আজই গিয়ে রেখে আসি। তেল দাও, যাই স্নানটা সেরে ফেলি।"

বেলা একটার সময় গরুর গাড়ী ঠিক থাকিতে বলিয়া স্নান করিতে গেলাম। স্নানান্তে আসিয়া পাতের কাছে বসিলাম মাত্র। ভাতের গ্রাস গলা দিয়া নামিতে চাহে না। চোখ ফাটিয়া কেবল জল আসে।

অর্দ্ধেক ভাত ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম, "বউমাকে চারটি খাইয়ে দাও। ছেলে এসে পৌঁছবার আগেই বেরিয়ে পড়া দরকার।"

খাটের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলাম। গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "গাড়ী সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়।"

"বউমা খেয়েছেন?"

"না, কিছুই খায়নি। আমারও মনের অবস্থা এমন নয় যে, পীড়াপীড়ি করি। চুলোয় যাক্—ওর ত এখন মরাই মঙ্গল।"

"এই কাল মোটে বউ এল। আজই হঠাৎ আবার বাপের বাড়ী চল্ল, লোকে জিজ্ঞেস কর্‌লে কি বল্‌বে?"

"বল্‌বো কি, বলেছি। বলেছি যে বেয়াই কাল রাতে বাড়ী ফিরে গিয়েই দেখলেন, তাঁর পরিবারের কলেরা হয়েছে। বাঁচবার আশা কম। তখনই লোক ছুটিয়ে দিয়েছিলেন মেয়েকে আন্‌বার জন্যে। অপর লোকের সঙ্গে না পাঠিয়ে কর্ত্তা নিজেই যাচ্ছেন তাঁকে রাখতে। গাড়োয়ানও এই কথাই জানে।"

"বউমাকে তৈরী হ'তে বলগে।" বলিয়া আমি জামা গায়ে দিলাম।

এই সময় বাহিরে ঠঠ-ঠং করিয়া বাইসিক্লের শব্দ হইল। কে আসিল? উঠিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, বাইসিক্ল্‌ হস্তে প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া, গাড়োয়ানের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তার পাশে, অপর বাইসিক্ল্‌ হস্তে তার সেই বর্দ্ধমানের বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ।

এক মিনিট পরে প্রফুল্ল ও সুরেন আসিয়া প্রবেশ করিল। উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত—দর-দর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। প্রফুল্ল আসিয়াই আমার পা জড়াইয়া বলিল, "বাবা আমায় মাফ্‌ করুন।"

"কেন, কেন বাবা, হঠাৎ কি হয়েছে?"

"শ্বশুর-মশায় তাঁর মেয়েকে এখানে রেখেই বর্দ্ধমানে গিয়েছিলেন আমায় আনতে। গাড়োয়ানের কাছেও শুন্‌লাম। বাবা, আপনি যখন জগদ্ধাত্রী পূজোর সময় বর্দ্ধমানে আমায় দেখতে গিয়েছিলেন, তখন আমি কারুর বিয়ের নেমন্তন্নে যাইনি, আমি গিয়েছিলাম শ্বশুরবাড়ী। আপনাদের লুকিয়ে গিয়েছিলাম,

সুরেন সব কথাই জান্‌তো, তাই আমায় বাঁচাবার জন্তে সে মিথ্যে ক'রে ঐ সব কথা আপনাকে বলেছিল।"

সুরেন ছোক্‌রা নত মস্তকে দাঁড়াইয়া।

শুনিয়া আমার বুক হইতে হাজার মণ পাথরের ভার নামিয়া গেল। আমি নিশ্বাস ছাড়িয়া, যুগ্মকর ললাটে স্পর্শ করিয়া, উদ্দেশে নারায়ণ প্রণাম করিলাম।

প্রফুল্লর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার গর্ভধারিণীও আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। সমস্ত শুনিয়া চোখে অঞ্চল দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন,—বোধ হয় বউমার কাছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্ল ও সুরেনকে স্নানাহার করাইতে লইয়া গেলেন।

অপরাহ্ণে স্বয়ং বেহাই-মশাই গোযানে আসিয়া উপস্থিত— কামারহাটী হইতে নয়, বর্দ্ধমান হইতে, প্রফুল্ল ও সুরেন্দ্রের সহিত একট্রেণে আসিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে সকল কথা শুনিলাম।

বর্দ্ধমান হইতে কামারহাটি যাইতে হইলে, পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে নামিয়া তিন ক্রোশ। কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে কামারহাটী অবধি পাকা সড়ক আছে, উহা সাত ক্রোশ ব্যবধান। প্রফুল্ল সাত ক্রোশ পথ বাইসিক্লে অতিবাহন করিয়া, শুধু সেই জগদ্ধাত্রী-পূজার ছুটিতে যে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছিল তাহা নয়, প্রতি শনিবারে শ্বশুরবাড়ী যাইত এবং সোমবার ভোরে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া, বাসায় আসিয়া স্নানাহার করিয়া কলেজ করিত। তার শ্বশুর জানিতেন

যে জামাই লুকাইয়া যাওয়া-আসা করে। স্বভাবতঃ তিনি জামাইয়ের গোপন কথা ব্যক্ত করিতে চাহেন নাই। মাঝে মাঝে চিঠি লিখিতেন, কোন চিঠিতেই কোনও দিন লেখেন নাই যে, প্রফুল্ল বাবাজীবন আসিয়াছিলেন তিনি ভাল আছেন, বর্দ্ধমানে ফিরিয়া গিয়াছেন। কথা তিনি প্রকাশ করিবেন না শাশুড়ীর কাছে এই আশ্বাস পাইয়াই প্রফুল্লর যাতায়াত তখন ঘন-ঘন হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু তাই নয়। শুনিলাম, পাজীটা নাকি বউমাকেও, নিজের পায়ে হাত দেওয়াইয়া শপথ করাইয়া লইয়াছিল যে, ঘর-বসত করিতে আসিয়া সে কথা তিনিও যেন এখানে প্রকাশ না করেন।

আমাদের কালে যে সব ব্যাপার একেবারেই অসম্ভব বলিয়া গণ্য ছিল, একালের ছেলেদের পক্ষে তাহা আর নাই, আমরা স্ত্রী-পুরুষে এই আলোচনা করিয়া গোপনে অনেক হাসাহাসি করিলাম।

আষাঢ় মাসে প্রফুল্লর পরীক্ষার ফল বাহির হইল। জলপানি ত পায়ই নাই, পাস হইয়াছে মাত্র, তাও থার্ড ডিভিজনে।

সুধার বিবাহ

১

বৃহদায়তন সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ। কর্ত্তা সাটিনমোড়া সোফায় হেলান দিয়া, রূপার গুড়্গুড়ি হইতে সোণার মুখনলে ধূম আকর্ষণ করিতেছিলেন। গৃহিনী অদূরে একখানি গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। কর্ত্তা-গিন্নীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

গিন্নী বলিলেন, "আর তুমি দো-মনা কর্‌ছ কেন? অতুলের সঙ্গেই খুকীর বিয়েটি দিয়ে ফেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়ে ডাগর হয়ে' উঠ্‌ল, ষেঠের কোলে চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছে, আর দেরী হ'লে সমাজে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "দেখ, তুমি ও-সব মতটতগুলো ছাড়। মেয়ে চৌদ্দ বছরের হয়েছে ত ভারি একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে কিনা হ্যাঁঃ!"

গিন্নী বলিলেন, "আবার কি? হিঁদুর ঘরের আইবুড়ো মেয়ে চৌদ্দ বছরের হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "কুয়োর ব্যাঙ! কুয়োয় ব'সে আছ, দুনিয়ার খবর ত রাখ না! বিলেতের, আমেরিকার বড় বড় ডাক্তারদের আজকাল মত এই যে, ষোল বছরের কমে কখনই মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ষোল বছরের কমে কখনই

আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না—নির্মলার দিইনি। আমার মত-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কায করবো না—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

গিন্নী বলিলেন, "তা আমরা ত বিলেতেও বাস করিনে, আমেরিকাতেও বাস করিনে। যে সমাজের যা প্রথা—"

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "এই কলকেতা সহরে কত বড় বড় লোকের ঘরে, বোল সতেরো কুড়ি বছরের পর্য্যন্ত আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে, সে খবর রাখ কুয়োর ব্যাঙ্? সেজন্যে তাদের কি কেউ নিন্দে কর্‌ছে, না তারা সমাজে মুখ দেখাতে পার্‌ছে না? ঐ ওদের হাতে মেয়ে দেবার কল্পনাও কোরো না—সে অসম্ভব একেবারে।"

"কেন, অসম্ভব কিসে শুনি? অতুলকে মেয়ে দিলে মেয়ে অজাতে পড়্‌বে, না অঘরে পড়্‌বে?"

"অ-জাতে পড়বে না তা স্বীকার করছি, কিন্তু অ-ঘরে পড়বে নিশ্চয়। তবে তোমরা অঘর বলতে যা বোঝ আমি সে অর্থে বল্‌ছিনে।"

"কি অর্থে বল্‌ছ তুমি?"

"তা হ'লে বুঝিয়ে বলি, শোন্। তোমার মেয়ে ধনী পিতার গৃহে আজন্ম প্রতিপালিত। ভূমিষ্ঠ হ'য়ে অবধি এতকাল সে যেভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত, যে ঘরে গেলে সে সমস্ত সে না পাবে, সেই ঘরই তার পক্ষে অঘর। তোমার মেয়ে দামী জরিপাড় শান্তিপুরী ভিন্ন অন্য শাড়ী পরে না। একখানা শাড়ী একদিন পরা হলেই ধোবাকে ফেলে দেয়। রূপোর বাল্‌তি

বাসনে খেয়ে-খেয়ে এমনই তার অভ্যাস হয়ে গেছে যে, কাঁসার থালা-বাসনে খেতে হ'লে তার গন্ধ লাগে। বিদ্যুৎ-পাখার তলায় না শুলে রাত্রে তার ঘুমই হয় না। দু'টো তিনটে দাসী সারাদিন তার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। সে কি তোমার ঐ দু'শো টাকা মাইনের অতুল-মাষ্টারের ঘরে গিয়ে, মিলের শাড়ী পোরে বঁটি পেতে কুট্‌নো কুট্‌তে পার্‌বে, না শিল পেতে বাটনা বাঁটতে পার্‌বে, না কয়লা ধরিয়ে ভাত রাঁধতে পার্‌বে ?"

গিন্নী নীরবে বসিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কেন, পার্‌বেই না বা কেন ? হ'লেই বা বড় মানুষের মেয়ে। হিঁদুর মেয়ে ত—মেম-সাহেব ত আর নয়! নিজের সংসারে, নিজের স্বামী পুত্তুরকে রেঁধে-বেড়ে খাওয়ান, ঘরের কাযকর্ম্ম করা—সেটা ত মেয়েমানুষের ভাগ্যের কথা। ও যদি বলে, আমি পারবো, ও যদি বলে আমি তাতেই খুসী, তবে আমরা কেন তাতে বাধা দিই ? দু'টিতে ভাব হয়েছে বড্ড, এ বিয়ে না দিলে মেয়ে কিন্তু আমার অসুখী হবে, তা তোমায় ব'লে রাখলাম। শুধু অসুখীই বা বলি কেন ? অধর্ম্ম হবে। মেয়েমানুষের যা প্রধান ধর্ম্ম—সতীধর্ম্ম—তাতে আঘাত লাগবে।"

কর্ত্তা কয়েক মুহূর্ত্ত সবিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তারপর বলিলেন, "ওঃ—এতদূর গড়িয়েছে ? খুকী তোমাকে বলেছে বুঝি ঐ সব কথা ? অ্যাঁ, দু'টিতে ভাব

হয়েছে বস্তু? তাই না কি?"—বলিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন।

গৃহিণী আনত-নেত্রে সভয়ে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভাব হয়েছে? অর্থাৎ লভ্ হয়েছে? ওর গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে। ডাক ত একবার হারামজাদীকে, কোথায় গেল? সব কথা তার নিজের মুখে শুনে একটা বিহিত করি।"

গিন্নী বলিলেন, "নাও, আর বাপগিরি ফলাতে হবে না। ভারী বিহিত করবে তুমি। সে স্কুলে চ'লে গেছে। এই ত গাড়ী তাকে রেখে ফিরে এল। এগারোটা বাজে, এখন উঠে স্নান করবে? না, আমার সঙ্গে ব'সে ব'সে ঝগড়াই করবে কেবল?"

কর্ত্তা ঘড়ির দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "হুঁ—আমিই ত ঝগড়া করছি বটে। কিন্তু তুমি যে ভাবিয়ে দিলে গিন্নী! 'ভাব হয়েছে' এ আবার কোন্ দেশী কথা?"

গিন্নী বলিলেন, "কেন, এই যে এখনই বল্‌ছিলে বিলেতের আমেরিকার ডাক্তারদের মত অনুসারেই আমাদের চলা উচিত। তা, সে সব দেশে বিয়ের আগে বর-কনের ভাব হয় না? মনের ভিতর একজনকে ভালবাসবে, বাইরে অন্যজনকে বিয়ে ক'রে তার ঘর করতে যাবে, এটা কি ধর্ম্ম?"

কর্ত্তা চিন্তান্বিতভাবে বলিলেন, "তা সেজন্যে বিশেষ চিন্তা নেই, লভ্-ফভ্ ও সবগুলো নিছক ছেলেমানুষী বৈ ত নয়।

দেখাশুনো বন্ধ হলে সেটা সময়ে আপনিই সেরে যাবে। আর, কিন্তু খপর্দ্দার সুধা যেন নির্ম্মলের বাড়ীতে না যায়, বুঝ্‌লে? তা হ'লেই ও সব বাঁদরামি দু'দিনেই চুকে-বুকে যাবে।"

"হ্যাঁ চু'কে যাবে! দিনকের দিন যতই বুড়ো হচ্চেন, ততই ভীমরতি ধর্‌ছে!"—বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তার স্নানের জন্য ভৃত্যগণের প্রতি আদেশ প্রচার করিতে উঠিয়া গেলেন।

তা, ব্যাপারটা এই। এই যিনি রূপার গুড়্‌গুড়িতে সোণার মুখনলে তামাক খাইতে খাইতে এতক্ষণ দাম্পত্যকলহে নিযুক্ত ছিলেন, ইঁহার নাম বরদাকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণী, তা ছাড়া দেশে জমিদারী আছে। অগাধ টাকা। ইঁহার দুই কন্যা, একটি মাত্র পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলহাসিনী বা নির্ম্মলা কলিকাতাতেই স্বামি-গৃহে বাস করে। তাহার বয়স আঠারো বৎসর মাত্র। তাহার স্বামী বিনয়ভূষণ প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক। শ্বশুরের তুল্য না হইলেও, বিনয়ভূষণ ধনী-লোক, দেশে তার বিষয়-সম্পত্তি আছে, চাকরিটুকুই ভরসা নহে। খুকী অর্থাৎ কনিষ্ঠা কন্যার নাম সুধাংশুনলিনী বা সুধা। তাহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, বেথুন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। বরদাবাবুর পুত্রটি এখন সপ্তমবর্ষীয় বালক মাত্র। অতুলও রসায়নের অধ্যাপক, কিন্তু বেসরকারী কলেজের। দুইশত টাকা মাত্র বেতন পায়। অতুল ও বিনয় পূর্ব্বে সহপাঠী ছিল। বন্ধু-গৃহেই বন্ধু-শ্যালিকা সুধার সহিত অতুলের পরিচয়ের সূত্রপাত। ক্রমে সেই পরিচয় রীতিমত

ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মলা ও তার স্বামী, উভয়েরই ইচ্ছা, অতুলের সঙ্গেই সুধার বিবাহ হয়।

অতুলের যেদিন আসিবার কথা, নির্ম্মলা সেদিন বাপের বাড়ী গিয়া সুধাকে লইয়া আসে। আবার সুধা কোনও দিন আসিলে, অতুলকে খবর দিতে বিনয় ভুলে না। বস্তুতঃ ইহাদিগের ষড়যন্ত্র বা সহযোগিতার ফলেই ব্যাপারটি এরূপ 'সঙীন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহারা দু'টি বোনেই সুন্দরী, তবে সুধা বেশী সুন্দরী। বিশেষ তাহার গাত্রবর্ণটি চমৎকার। এমন রঙটি বাঙ্গালী-ঘরে দুর্লভ—আর্ম্মাণী বিবির অপেক্ষা কিছুমাত্র হীনপ্রভ নহে।

২

তিন মাস পরে, একদিন সন্ধ্যায় আপিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ করিতে করিতে বরদাবাবু পত্নীকে বলিলেন, "ওগো, কাল্‌কে খুকীকে দেখতে আস্‌বে।"

"কারা, কোথা থেকে?"

"মৈমনসিং জেলার মুকুন্দনগরের রাজবাড়ী থেকে। রাজা মুকুন্দনাথের নাম শুনেছ ত? মস্ত বড়লোক। যেখানে তাঁর রাজধানী, সেখানকার নাম পূর্ব্বে কি একটা ছিল; এখন এই রাজার নামে সে স্থানের নাম মুকুন্দনগর হয়েছে। রাজা উপাধি হ'লে কি হয়, অনেক মহারাজার চেয়ে টাকা বেশী।"

গৃহিণী বলিলেন, "রাজা মুকুন্দনাথের নাম ত ছেলেবেলা থেকে শুনছি। তাঁর বয়স হয়েছে নিশ্চয়! এ বয়সে আবার বিয়ে করবেন নাকি ?"

"দূর পাগলী! রাজা কেন, রাজকুমারের জন্তে। রাজা মুকুন্দনাথের এক মামা, কুমারের গৃহশিক্ষক, তার এক বন্ধু, আর একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত—এই চা'রজনে কুমারের জন্তে পাত্রী খুঁজতে বেরিয়েছে। আমাদের স্ব-শ্রেণীর লোক যিনি যেখানে আছেন, সকলের বাড়ী গিয়ে তারা মেয়ের সন্ধান করছে। তিন মাস হ'ল তারা এই কাযে বেরিয়েছে, নানা স্থানে ঘুরে এখন তারা কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছে।"

"রাজকুমারের বয়স কত ?"

"কুড়ি-একুশ।"

"স্বভাব-চরিত্র কেমন ? বড়লোকের ঘরের বওয়াটে ছেলে নয় ত ? তা যদি হয়, তা হ'লে কিন্তু তাঁকে মেয়ে দেবো না, তা তিনি রাজকুমারই হোন্ আর বাদশা-কুমারই হোন্।"

এই কথায় বরদাবাবু একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন; লুচি ছিঁড়িয়া আলুর দমে মাখিতে মাখিতে বলিলেন, "তা স্বভাব ভাল হবারই সম্ভাবনা। অত বড় রাজার ছেলে!"

গিন্নী বলিলেন, "থা বল্লে! বড়লোকের ছেলের, রাজার ছেলের স্বভাব-চরিত্র কি আর বেগড়ায় ? যত বেগড়ায় গরীবের ছেলের! যত গরীব কেরাণী, মাষ্টার, এদের ছেলেরাই সচরাচর

মদ খেয়ে কু-পল্লীতে প'ড়ে থাকে, রাত্রে বাড়ী আস্‌তে পারে না—নয় ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে কথা বল্‌ছিনে। তবে সম্বন্ধ হ'লে একটা জিনিষ আছে ত ? সে যাই হোক, মেয়ে যদি তাদের পছন্দই হয়, সে সব বিষয়ে খোঁজ খবর না নিয়েই কি আর বিয়ে দেবো ?"

"কখন দেখতে আস্‌বে ?"

"কাল বিকেলে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে। আমি তিনটের পরেই আপিস থেকে ফিরে আসবো।"

"নির্ম্মলাকেও আনানো উচিত ত ?"

বরদাবাবু যেন কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "আচ্ছা, আনিও তাকে।"

অতঃপর বরদাবাবু নীরবে জলযোগ সমাপ্ত করিলেন। তিনি যখন উঠিতেছিলেন, গৃহিণী তখন বলিলেন, "হ্যাগা, তবে যে বলেছিলে, মেয়ের ষোল বছর বয়স না হ'লে কোন মতেই বিয়ে দেবে না—তোমার মত্‌-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কায করবে না !"

ভৃত্য রূপার জগ্ হইতে জল ঢালিতেছিল, প্রকাণ্ড রূপার চিলিমচির উপর বরদাবাবু হস্ত প্রক্ষালন করিতেছিলেন, সহসা কোনও উত্তর দিলেন না। মুখাদি ধৌত করিয়া তোয়ালে দিয়া হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এক সময় তাই বল্‌তাম বটে। এখন ভেবে দেখছি, এরকম একটা সুযোগ যদি পাওয়া যায়—"

গৃহিণী বলিলেন, "তা হ'লে বল, তোমার মত-বিশ্বাস-বিশ্বাস কিছুই নয়—ও-সব ভণ্ডামি মাত্র, তুমি একজন সুযোগবাদী!"

বরদাবাবুর মনে হইল, সুযোগবাদী না হইলে কি তিনি এত বড় একটা এটর্ণী হইতে পারিতেন? কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ গিন্নী, তোমায় যখন বিয়ে ক'রে এনেছিলাম, তখন তখন তুমি ক-খও চিন্‌তে না। নিজে রাত জেগে মাষ্টারি ক'রে তোমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, তার কি এই প্রতিফল?"

"কেন?"

"নইলে আজ তুমি আমায় এমন সাধু-ভাষায় গালাগালি দিচ্ছ!"

"কখন আবার তোমায় আমি গালাগালি দিলাম?"

"কেন, শালা না বল্লে কি গালাগালি হয় না? ঐ যে তুমি আমায় সুযোগবাদী বল্লে!"

"সেটা বুঝি গালাগালি হ'ল?"

"ভয়ঙ্কর! তুমি যদি পরিবার না হ'য়ে খবরের কাগজের সম্পাদক হ'তে, তা হ'লে আমি তোমার নামে মানহানির নালিশ ক'রে দিতাম।"

সেই রাত্রিতেই সুধা শুনিল, রাজবাড়ীর লোকে তাহাকে দেখিতে আসিবে। শুনিয়া তাহার প্রাণে বড়ই ভয় হইল। এই তিন মাস কাল অতুলের সহিত সাক্ষাৎ নাই—পিতার আদেশে দিদির বাড়ী যাওয়া তাহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবে

দিদি মাঝে মাঝে আসে বটে, এবং দিদির নিকট হইতে অতুলের সংবাদ পায়। দিদির মধ্যস্থতায় অতুলের সঙ্গে গোপনে সে পত্রব্যবহার করিবার অভিলাষও জ্ঞাপন করিয়াছিল, কিন্তু নির্মলা তাহাতে রাজি হয় নাই, বলিয়াছিল, "না ভাই, কি জানি, বাবা যদি শেষ পর্য্যন্ত মত্‌ নাই করেন, সে সব তুই ভুলে যাবারই চেষ্টা কর্।" সুধা বলিয়াছিল, "দিদির যেমন কথা! চেষ্টা কর্‌লেই বুঝি মানুষকে মানুষ ভুল্‌তে পারে?"

সে রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলো নিবাইয়া বিছানায় বসিয়া সুধা প্রথমটা খানিক কাঁদিল। তারপর আলো জ্বালিয়া, নিজ আলমারি হইতে অতুলের ফটোগ্রাফখানি বাহির করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সেখানি দেখিল। শেষে আলো আবার নিবাইয়া অতুলের ছবিখানি বালিসের তলায় রাখিয়া মনে মনে দেব-দেবীগণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে মা কালী, হে মা দুর্গা, হে বাবা মহাদেব, হে বাবা জগন্নাথ! তোমাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। রাজবাড়ীর সেই পাজি ছুঁচোগুলো আমায় যেন পছন্দ না করে।—আমায় যেন তারা বিষ-নয়নে দেখে! আমি তোমাদের সব্বাইকের পূজো দেবো—আমায় তোমরা রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

আজ রাত্রিতে সুধার ভাল ঘুম হইল না। মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে। দেব-দেবীগণের চরণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রার্থনা করিতে করিতে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। অতুলের ছবিখানি দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ভয়ে আলো জ্বালিতে পারে না, কারণ

পাশের কক্ষেই মাতা শয়ন করেন এবং মাঝের দরজা খোলাই থাকে। পূর্ব্বে কতবার রাত্রি জাগিয়া নভেল পড়িতে গিয়া ধরা পড়িয়া মা'র নিকট বকুনি খাইয়াছে। আজ এমন করিয়াই রাত পোহাইল।

বেলা একটার সময় নির্ম্মলাকে আনিবার জন্ত গাড়ী পাঠানো হইল। দুইটার মধ্যেই নির্ম্মলা আসিয়া পৌছিল।

রাজবাড়ীর লোকেরা যথাসময়ে আসিয়া কন্তা দেখিলেন। জ্যোতিষী-মহাশয় প্রথমে সুধার কোষ্ঠীখানি পরীক্ষা করিয়া, অভিমত প্রকাশ করিলেন, "মেয়েটি সুলক্ষণা বটে।" রাজ-মাতুল বলিলেন, "বরদাবাবু, এতদিনে আমাদের ভ্রমণ শেষ হ'ল। চা'র মাস কাল আমরা নানা স্থানে মেয়ে দেখে বেড়াচ্চি, কিন্তু আপনার মেয়ের মত এমন সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে আমরা কোথাও পাইনি। রঙটার উপরেই রাজা-বাহাদুরের বিশেষ রকম ঝোঁক। আপনার এই মেয়ের মত বা এর চেয়েও সুশ্রী মেয়ে যে আমরা দেখিনি, তা নয়। তবে গায়ের এমন বর্ণ টি আর কোথাও পাইনি। যাকে শাস্ত্রে আসল গৌরী বলে, এ মেয়ে তাই। এই মেয়েই আমাদের পছন্দ। আজ রাত্রেই আমরা দেশে ফিরে, রাজা-বাহাদুরকে রাণীমাকে গিয়ে সব কথা বলি। কুমার বাহাদুর হয়ত নিজে এসে একবার দেখতে চাইবেন। তারপর শুভকার্য্যের দিন স্থির করা যাবে। যদি অনুমতি করেন, আজ তা হ'লে আমরা উঠি।"

বিবাহ-পরীক্ষায় মেয়ের এই উচ্চ অনার্সের সহিত পাসের

সংবাদে বরদাবাবু আনন্দে বিহ্বল হইলেন। কিঞ্চিৎ "মিষ্টমুখ" করিয়া যাইবার জন্ত ইঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই বিলক্ষণ আয়োজনাদি চলিতেছিল। শুধু মিষ্টরসে নহে, ষড়্‌রসে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া আগন্তুকগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহিণীও আনন্দিত হইলেন। এ তিন মাসে তাঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সুধা অতুলকে ভুলিয়াছে। মেয়ে রাজরাণী হইবে, এ সংবাদে কোন্ মাতা না আনন্দিত হইবেন?

সুধার কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়াই রাত্রি কাটিল। অবশেষে সে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল,—দেব-দেবীগণ সমস্তই ঝুটা;—হিন্দুধর্ম্ম একেবারেই ফাঁকি।

৩

কুমার-বাহাদুর কবে সুধাকে দেখিতে আসিবেন, এই চিন্তায় বরদাবাবু দিবানিশি ব্যস্ত রহিলেন। সপ্তাহান্তে মুকুন্দনগর হইতে পত্র আসিল। রাজ-মাতুল লিখিয়াছেন, "আমরা ফিরিয়া আসিয়া রাজা-বাহাদুর ও রাণীমার বরাবর আপনার কন্তার বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছি। শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। কুমার-বাহাদুর যাইবেন না, তবে রাজা-বাহাদুর স্বয়ং একবার গিয়া আপনার কন্তাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি রাজকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা

বিদায়, বোধ হয়, আগামী মাসের পনরই শুভ কলিকাতা যাত্রা করিতে পারিবেন।”

সুতরাং রাজা-বাহাদুরের শুভাগমনের এখনও প্রায় একমাস বিলম্ব আছে জানিয়া বরদাবাবু আবার নিজ কাযকর্ম্মে মনঃসংযোগ করিলেন।

অতুলবাবু তাঁহার বন্ধু বিনয়বাবুর মুখে বরদাভবনের সকল সংবাদই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পাইয়া থাকেন। মুকুন্দনগর রাজবাড়ীর লোকেদের মেয়ে দেখার কথা, গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে রাজা-বাহাদুরের বিশেষ ঝোঁকের কথা এবং একমাস পরে রাজা-বাহাদুর যে স্বয়ং কন্যা দেখিতে আসিবেন, সে সংবাদও পাইলেন।

দুই বন্ধুতে অত্যন্ত গোপনে কি পরামর্শ চলিতে লাগিল।

অতুলবাবু প্রত্যহ নিজ কলেজের পর প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়া বিনয়বাবুর রসায়নাগারে দুই তিন ঘণ্টা করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। উভয়েই রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। উভয়ে মিলিয়া কি সব রাসায়নিক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন তাঁহারাই জানেন।

সপ্তাহকাল দুইজনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বসিয়া এইরূপে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাইলেন।

তাহার পর একদিন নির্ম্মলা কিসের একটা শিশি বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া পিত্রালয়ে গিয়া তাহার কনিষ্ঠাকে দিল। চুপি চুপি কি সব উপদেশও তাহাকে দিয়া আসিল। সুধা শিশিটা নিজ আলমারির মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

ইহার কয়েকদিন পরে, সন্ধ্যার পর কর্ত্তা-গৃহিণীতে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। রাজা বাহাদুরের আসিবার ত অধিক-বিলম্ব নাই —এক সপ্তাহ মাত্র। মেয়ে দেখিয়া, কবে বিবাহের দিনস্থির হইবে, সে বিষয়ে যদি মতামত জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁহাকে কি বলা যাইবে, এই সম্বন্ধে বরদাবাবু পত্নীর সহিত আলোচনা করিতে চাহিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "দিনস্থির ত করবে, কিন্তু মেয়ের ভাবভঙ্গি দেখে আমি যে মোটেই সাহস পাচ্ছিনে।"

"কেন, কি ভাবভঙ্গি দেখলে?"

"সেইদিন তারা এসে মেয়ে দেখা অবধি, ও যেন কেমন মনমরা হ'য়ে থাকে। মুখে হাসি নেই, ভাল ক'রে খায় না,—রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদে এও আমি টের পেয়েছি। দেখছ না, কি রকম রোগা হয়ে যাচ্ছে, ভেবে ভেবে বাছার আমার সোণার বরণ কালী হয়ে যাচ্চে। মেয়ে ডাগর হয়েছে, তার অমতে জোর জবরদস্তি ক'রে বিয়ে দিতে চাইলে শেষে হিতে বিপরীত হ'য়ে না দাঁড়ায়।"

বরদাবাবু বলিলেন, "হ্যাঃ—ঐ সব ছেলেমানুষী কথা শোন কেন?"—কিন্তু মনে মনে তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বলাই যায় কি, কালের যেরূপ গতি, কাপড়ে কেরোসিন ভিজাইয়া আগুনই ধরাইয়া দিবে, না আফিম আনাইয়া ভক্ষণ করিবে, কে বলিতে পারে? গৃহিণীকে অবশেষে তাঁহার আশঙ্কার কথা খুলিয়াই বলিলেন এবং মেয়ে সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন।

পরদিন বরদাবাবু সুধাকে ডাকিয়া মিষ্ট-কথায় তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন। কিন্তু সুধা কোনও উত্তর করিল না —কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

দিনের পর দিন এই ভাবেই কাটিতে লাগিল। দিনের পর দিন সুধার দেহবর্ণ মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল। কন্যার এ অবস্থা দেখিয়া বরদাবাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভাবী পুত্রবধূর গাত্রবর্ণের উপরই যে রাজার অত্যধিক ঝোঁক।

মুকুন্দনগর হইতে পত্র আসিল, অমুক দিন অমুক সময় স-পারিষদ রাজা-বাহাদুর মেয়ে দেখিতে বরদাভবনে উপস্থিত হইবেন।

বড় বড় সাহেবী দোকান হইতে বরদাবাবু মেয়ের জন্য দামী দামী ফেসক্রীম, কম্‌প্লেক্সন-লোশন প্রভৃতি আনিয়া দিলেন। তাঁহার কড়া আদেশে সে সকল সুধার সর্ব্বাঙ্গে মালিসও হইতে লাগিল। কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইল ;—মেয়ে দিন দিন কালো হইতে লাগিল।

৪

রাজা-বাহাদুরের আসিবার আর একদিন মাত্র বিলম্ব আছে। আগামী কল্য প্রাতের ট্রেণে তিনি আসিয়া পৌঁছিবেন এবং অপরাহ্ণকালে মেয়ে দেখিতে আসিবেন। কি উপায় হইবে, প্রাতঃকালীন চা-পানান্তে দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া ইহাই

বরদাবাবু চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার গৃহদ্বারে একখানি মোটর গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ হইল।

বরদাবাবু জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক একটা ট্যাক্সি হইতে নামিতেছেন। দেহটি স্থূল, গায়ে একটা আধময়লা খুতি পিরাণ, তার উপর ময়লা এবং লাট হইয়া যাওয়া একটা সিল্কের চাদর।

কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বারবান আসিয়া নিবেদন করিল, মুকুন্দনগর রাজবাড়ীর একজন কর্ম্মচারী দর্শনপ্রার্থী।

"নিয়ে এস"—বলিয়া বরদাবাবু গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

লোকটি দ্বারবানের সহিত আসিয়া, বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া প্রবেশ করিল। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত বরদা বাবুকে নমস্কার করিয়া বলিল, "অসময়ে এসে হুজুরকে বিরক্ত করলাম না ত ?"

বরদাবাবু বলিলেন, "না না বিলক্ষণ। বিরক্ত কেন করবেন ? বসুন বসুন।"

লোকটি হাত যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, সে গোস্তাকী কি করতে পারি ? আজ বাদে কাল হুজুর হবেন আমার অন্নদাতা মনিবের বৈবাহিক—সুতরাং হুজুরও মনিবস্থানীয়। দু'-একটা কথা নিবেদন করবার জন্যে এসেছিলাম, হুকুম হ'লে বলতে পারি।"

বরদাবাবু বলিলেন, "বলুন না, আমাদের সঙ্গে ও সব

কর্ম্মালিটির কিছু দরকার নেই। বসুন বসুন, দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন কতক্ষণ ?”

লোকটি সঙ্কুচিতভাবে চেয়ারে বসিয়া বলিল, “আমাদের রাজা-বাহাদুর কাল সকালের ট্রেণে আসবেন, এই স্থির ছিল। হুজুরকেও পত্রে তা জ্ঞাত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি হঠাৎ আজকেই এসে পড়েছেন। ল্যান্সডাউন রোডে নাটোর রাজবাড়ীতে উঠেছেন। আমাকে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, কালকের পরিবর্ত্তে আজ বিকেলে তিনি যদি মেয়ে দেখতে আসেন, তাতে আপনাদের কোনও অসুবিধে আছে কি ? কারণ কাযটা যদি আজ সেরে ফেলতে পারেন, তা হ'লে আজ রাত্রেই আবার রাজধানী রওয়ানা হতে পারেন, সেখানে জরুরী কায আছে।”

বরদাবাবু বলিলেন, “রাজা-বাহাদুর পৌঁছে গেছেন না কি ? বেশ বেশ। তা আজ বিকেলে যদি তিনি আসেন তাতে আমার কোনই অসুবিধে নেই। আমি বরঞ্চ নাটোর-রাজবাড়ীতে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বো। ক'টার সময় যাব বলুন দেখি ?”

লোকটি বিনীতভাবে বলিল, “আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন ? আমি ত বাড়ী দেখে গেলাম। আমিই তাঁকে সঙ্গে ক'রে আন্‌বো। আচ্ছা যদি অনুমতি হয়, এখন তা হ'লে উঠি।” বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বরদাবাবু বলিলেন, “বসুন বসুন, তাড়াতাড়ি কি ? একটু চা খেয়ে যান।”

লোকটি বলিল, "আজ্ঞে তা আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করবো। কিন্তু তার সঙ্গে আরও একটু প্রার্থনা আছে।"

"কি, বলুন।"

"মাকে—আমাদের বউ-রাণীমাকে এখন একবার দেখতে পাব না? ও-বেলা অবশ্য রাজা-বাহাদুরের সঙ্গে এসে ত দেখবই। কিন্তু মা'র রূপ-গুণ সম্বন্ধে যে রকম বর্ণনা শুনেছি,—তাঁকে একটিবার দেখবার জন্যে মনটা বড়ই উতলা হয়েছে।"

বরদাবাবু ভৃত্যদ্বারা সুধাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

এক মিনিট পরেই সুধা আসিয়া বলিল, "ড্যাড্, আমায় ডাক্‌ছেন?"

"হ্যাঁ মা। মুকুন্দনগর রাজবাড়ী থেকে এই ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তোমার মাকে গিয়ে বল এঁর জন্যে এক পেয়ালা চা, আর কিছু খাবার যেন পাঠিয়ে দেন।"

লোকটি বলিল, "বরদাবাবু, থাক্ থাক্। চা খাব ওটা ভুলে বলেছি। আমার এখনও যে স্নান-আহ্নিক হয়নি সেটা খেয়ালই ছিল না। মা লক্ষ্মি, তুমি বাড়ীর ভিতর যাও ত।"

একে ত মুকুন্দনগর রাজবাড়ীর নাম শুনিয়াই সুধা জ্বলিয়া গিয়াছিল। কে এ ব্যক্তি যে এমন আদেশের স্বরে তাহার সহিত কথা কহে? উভয় নেত্র হইতে লোকটার প্রতি অগ্নিবাণ হানিয়া সুধা প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া যাইবামাত্র আগন্তুকের মুখ হইতে সেই বিনীত ও নম্রভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ব্যঙ্গপূর্ণ-স্বরে তিনি

বলিলেন, "এইটিই ত আপনার মেয়ে সুধাংশুনলিনী ? মুকুন্দ-নগরের রাজবাড়ীর লোকেরা এই মেয়েকেই ত দেখে গিয়েছিল ?"

কথা বলার ধরণে বরদাবাবু একটু রুষ্টভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই।"

লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কেন মশাই, আর কি জুচ্চুরি করবার জায়গা পেলেন না ? এই মেয়ে আপনার আর্ম্মাণী বিবির মতন সুন্দরী ? এ ত রীতিমত শ্যামবর্ণ—কালো বল্লেও অন্যায় হয় না। বলি, কি রং-টং আরক-টারক মাখিয়ে রাজবাড়ীর লোকেদের চোখে সেদিন ধুলো দিয়েছিলেন, বলুন ত ?"

বরদাবাবুও ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মশাই, স'রে পড়ুন দেখি। ফের যদি কোনও অপমানসূচক কথা এখানে উচ্চারণ করেন, তবে দারোয়ান দিয়ে আপনাকে বের ক'রে দেবো। আপনার রাজাকে গিয়ে না হয় বলবেন আমার মেয়েকে যে রকম দেখে গেলেন,—তাতে তিনি আমার মেয়েকে না নেন, নাই নেবেন।"

লোকটি বলিল, "রাজা-বাহাদুরকে কোনও কথা বলবার দরকার হবে না,—কারণ আমিই রাজা মুকুন্দনাথ রায়। আমি ইচ্ছা ক'রেই একদিন আগে কলকাতায় এসেছি—আর, মেয়ের যথার্থ স্বরূপ কি তাই দেখবার জন্যেই, নিজের কর্ম্মচারী সেজে অসময়ে এ ভাবে এসেছি। কারণ, আমি জানি, কলকাতার লোকেরা অনেকে ভয়ানক জোচ্চোর। তার উপর বাঙ্গাল দেশের লোককে তারা গো-গর্দ্দভ ব'লেই মনে করে—তাবে বাঙ্গালকে

অতি সহজেই ঠকানো যায়। কিন্তু সেটা আপনাদের ভুল। বাঙ্গালকে সহজে ঠকানো যায় না। ভাগ্যিস্ এভাবে এসে দেখলাম! নইলে ও-বেলাই ত আবার রং-টং মাখিয়ে পেত্নীর বাচ্ছাটিকে পরীর বাচ্ছা সাজিয়ে দেখাতেন! উঃ—বাপরে বাপ—কলকাতার লোকেরা কি জোচ্চোর—কি জোচ্চোর!"—বলিয়া গট্ গট্ করিয়া সদর্পে রাজা বাহির হইয়া গেলেন।

৫

তার পর কি হইল? প্রমাণ হইল হিন্দু-দেব-দেবীগণ মিথ্যা নহেন, হিন্দুধর্ম্মও ফাঁকি নহে। সুধার এতদিনকার সকরুণ আবেদনে দেব-দেবীগণ কর্ণপাত করিয়াছেন।

বরদাবাবু অবশেষে বুঝিলেন, অতুল ছাড়া অন্য পাত্রে বিবাহ দিলে মেয়ে সুখী হইবে না—হয়ত বাঁচিবেই না। সুতরাং বিবাহে তিনি মত করিলেন।

সুধার মুখে আবার হাসি দেখা দিল। দিদির দেওয়া সেই আরকের শিশিটা খালি হইয়া গিয়াছিল, আর তাহা ভর্ত্তি করিয়া আনানোর প্রয়োজন হইল না।

মলিন বর্ণ দিনে দিনে আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। পরের মাসে বিবাহ। সুধার দেহবর্ণ তখন আবার পূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে।

বিবাহ হইয়া গেলে বিনয়বাবু বরের কাণে কাণে বলিলেন,—"জয়, রসায়নের জয়!"

বি-এ পাস কয়েদী

১

পশ্চিমের একটি সহর। জজের আদালত, ফৌজদারী আদালত, কালেক্টরী প্রভৃতি সহরের ভিতর হইলেও, জেলখানাটি সহরের বাহিরে এক মাইল দূরে অবস্থিত। জেলের কর্ত্তা অর্থাৎ জেলর (Jailor) বাবুর নাম ইন্দুভূষণ সান্যাল—বয়স চুয়াল্লিশ বৎসর। স্ত্রীর নাম মনোরমা, বয়স আটত্রিশ। ইঁহাদের দুইটি পুত্র—নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র, বয়স পনর এবং পাঁচ বৎসর। কন্যা হয় নাই।

জেলখানার ফটকের উপর দ্বিতলে জেলরবাবুর সরকারী বাসা। পশ্চাতে টানা বারান্দা। সে বারান্দায় দাঁড়াইলে জেলখানার ভিতরটা অনেকখানি দেখা যায়। জেলরবাবুর স্ত্রী মনোরমা সকালে বিকালে সেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া জেল-প্রাঙ্গণে কয়েদিগণের আহার, গতিবিধি ও অন্যান্য কার্য্যকলাপ দেখিয়া চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন।

মনোরমার বড় কষ্ট। কোনও প্রতিবেশিনী বাড়ী এসে আসিয়া দুই দণ্ড গল্প করিবে, দু'হাত তাস খেলিবে, অথবা চুলটা তাঁহার বাঁধিয়া দিবে। ডেপুটি জেলরবাবু, অ্যাসিষ্টাণ্টবাবু, জেলের ডাক্তারবাবু—সকলেই বাঙ্গালী, ইঁহাদেরও সরকারী বাসা রহিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী নাই, বা থাকিয়াও নাই। ডেপুটিবাবু

বিপত্নীক, অ্যাসিষ্টাণ্টবাবুর স্ত্রী তিন মাস হইল সন্তান-সম্ভাবিতা হইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন, তাহার স্থিরতা নাই, ডাক্তারবাবুর গৃহের যিনি গৃহিণী, তাঁহাকে ডাক্তারবাবু স্ত্রী বলিয়াই প্রচার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জনশ্রুতি এই যে, বিবাহটা তাঁহাদের গান্ধর্ব্ব মতে হইয়াছিল—কাযেই উক্ত মহিলার কোনও ভদ্রপরিবারের সহিত মেলামেশা নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পিত্রালয় হইতে মনোরমা এক অনাথা কায়স্থ-কন্যাকে ঝি-স্বরূপ আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিল। সে প্রায় মনোরমার সমবয়সী ছিল, তার নাম ছিল—কাতু বা কাত্যায়নী। নামে ঝি হইলেও, পূর্ব্বকালে রাজকন্যাদের যেমন "সহচরী" থাকিত, কাতু ছিল মনোরমার সেইরূপ সহচরী। উভয়ে বেশ আনন্দেই ছিল। কিন্তু গত বৎসর কাতুর গুরুজন-পদস্থ কোনও আত্মীয়ের বিনা বেতনে একটি ঝির প্রয়োজন হওয়াতে, সে ব্যক্তি অনেক স্নেহ, করুণা এবং আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কাত্যায়নীকে পত্র লেখে এবং অবশেষে পুত্র পাঠাইয়া তাহাকে লইয়া যায়।

মনোরমাকে গৃহকার্য্য বেশী করিতে হয় না। বামুন আছে, চাকর আছে, তা ছাড়া সরকার হইতে দুই জন জল-আচরণী কয়েদী পাওয়া যায়, তাহারা প্রাতে আসিয়া জল তোলে, বাসন মাজে, গ্রীষ্মকালে পাখা টানে। বিকালে পাঁচটার সময় তাহাদের অবশ্য আবার জেলে প্রবেশ করিতে হয়। সাংসারিক কায-কর্ম্ম তেমন নাই, কি করিয়া মনোরমার দিন কাটে? তার স্বামী

দুইখানি মাসিকপত্রের গ্রাহক—মাসের প্রথম সপ্তাহটা সেইগুলি পড়িয়া কাটে। আর বাকী সাড়ে তিন সপ্তাহ? উপন্যাস—তাও কালে-ভদ্রে দুই-একখানা কেনা হয় মাত্র। সুতরাং মনোরমার বড় কষ্ট।

২

জেলরবাবু প্রাতে উঠিয়া চা-পানান্তে সাতটার সময় আপিসে যান, আবার সাড়ে দশ কিংবা এগোরাটায় বাড়ী আসিয়া স্নানাহার করেন। তৎপরে দিবানিদ্রান্তে বেলা সাড়ে তিনটায় উঠেন এবং চারিটার সময় আবার আপিসে গিয়া দুই তিন ঘণ্টা সরকারী কার্য্য করিয়া থাকেন।

আজ আহারাদির পর মনোরমার যখন অবসর হইল, তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

মনোরমা পশ্চাতের বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া, খোলা চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া, একখণ্ড মাসিকপত্র হাতে লইয়া শয়ন করিল। চুল শুকাইবার উদ্দেশ্যেই এ সময় এভাবে তাঁহার শয়ন। ভিতরের ঘরে পালঙ্কের উপর তাহার স্বামী নিদ্রিত, বড় ছেলে নগেন স্কুলে গিয়াছে, ছোট খোকা অনেক দুষ্টামি করিবার পর অবশেষে পিতার পাশে শুইয়া ঘুমাইয়াছে।

মনোরমা পত্রিকার ছবিগুলি দেখা শেষ করিয়া, তার পর সূচিপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল। এ সংখ্যায় কয়টা গল্প আছে,

তাহাই দেখিবার বিষয়। গল্প-সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আপন মনে বলিল, "পোড়ারমুখো কাগজওয়ালাদের একটু যদি আক্কেল আছে! কেবল প্রবন্ধ আর প্রবন্ধ, কচুপোড়া খাও! প্রবন্ধ নিয়ে ত মানুষ ধুয়ে খাবে! হাতীর মত কাগজখানা —তিনটি মোটে গল্প! এ পড়তে কতক্ষণই বা লাগ্‌বে?"—বলিয়া প্রথম গল্পটি পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গল্পের অর্দ্ধেকটা পড়া হইবার পূর্ব্বেই পত্রিকাখানি বুকে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা যখন আড়াইটা, তখন হঠাৎ মনোরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কে তার পায়ে হাত দিয়া নাড়া দিতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, ঠিকাদারবাবুর স্ত্রী সরোজিনী। "ও মা, তুমি!" বলিয়া মনোরমা উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "কতক্ষণ এসেছ, ভাই?"

সরোজিনী বলিল, "তা প্রায় আধ ঘণ্টা হবে!"

"আধ ঘণ্টা চুপ ক'রে ব'সে আছ? আমায় জাগালে না কেন?"

"আহা অকাতরে শুয়ে ঘুমুচ্ছ, তুলতে মায়া হ'ল। শেষে যখন দেখলাম, ঘুম আর ভাঙ্গে না, তখন কি করি, অগত্যা পাপ কাযটাই ক'রে ফেল্লাম। তা দিদি, খবর স" ভাল ত? ছেলে-পিলে ভাল আছে? দশ-বারো দিন আসতে পারিনি, মেজ ছেলেটার জ্বর হয়েছিল।"

মনোরমা বলিল, "কটিকের জ্বর হয়েছিল? কি জ্বর? কেমন আছে, এখন বেশ সেরে উঠেছে ত?"

সরোজিনী বলিল, "হ্যাঁ ভাই, এখন সেরে উঠেছে তোমাদের আশীর্ব্বাদে। সর্দ্দি-জ্বরই হয়েছিল, তবু ভাবনা ত কম হয় নি! চার দিন হ'ল জ্বরটা ছেড়েছে, কাল দু'টি মাছের ঝোল ভাত খেয়েছে। তোমাদের খবর সব ভাল ত?"

"হ্যাঁ ভাই, আমরা ভালই আছি। বোসো একটু, চোখে-মুখে জলটা দিয়ে আসি। এই মাসিকপত্রখানা ওল্টাও ততক্ষণ।"—বলিয়া মাসিকপত্র নবাগতার হাতে দিয়া মনোরমা উঠিয়া গেল।

সরোজিনী মাসিকপত্রের ছবিগুলা দেখা শেষ হইলে, কাগজ রাখিয়া বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়া জেলের প্রাঙ্গণের দৃশ্য দেখিতে লাগিল;—বিশেষ দেখিবার তখন যদিও কিছু ছিল না। কয়েদীরা সব বাহিরে কায করিতে গিয়াছে, কেবল চারি জন কয়েদী প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ পুষ্করিণী হইতে ঘড়া-ঘড়া জল তুলিয়া বাঁকে ঝুলাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে, আবার খালি ঘড়া লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

সরোজিনীর স্বামী ভূতনাথবাবু এই জেলের ঠিকাদার। কয়েদীদের আহারের জন্য চাউল, দাইল, নুণ, তেল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই তিনি সরবরাহ করিয়া, মাসান্তে জেলরবাবুর নিকট তাঁহার বিল দাখিল করেন। সরকারী হুকুম অনুসারে জেলর-বাবুকে প্রতি রবিবারে সহরে গিয়া খাদ্য-দ্রব্যাদির বাজার-দর জানিয়া আসিতে হয়, তজ্জন্য তিনি গাড়ীভাড়া পাইয়া থাকেন। তিনি সেই জ্ঞান অনুসারে ঠিকাদারবাবুর বিল সংশোধনান্তে উহা পাস করেন। সুতরাং জেলরবাবুর উপর ঠিকাদারবাবুর

অসীম ভক্তি। দেখা হইলেই আভূমি নত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করেন এবং অপর কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিলে, কারণে অকারণে জেলরবাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, ধার্ম্মিকতা, এমন কি তাঁহার আকৃতি অবয়বের পর্য্যন্ত অজস্র প্রশংসা করিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, "কি বলেন মশাই, অ্যাঁ? আমি একটি বর্ণও বাড়িয়ে বল্‌ছি?" এ-দিকে আবার ঠিকাদার-গৃহিণীও, জেলর-গৃহিণীকে "দিদি" বলিতে অজ্ঞান। বাড়ীতে গাই আছে, খাঁটি দুধের ছানা কাটিয়া সন্দেশ করিয়া আনিয়া দেয়, কুল পাকিলে কুলের আচার, কাঁচা আম উঠিলে কাসুন্দি ও আম-তেল প্রস্তুত করিয়া উপহার দেয়। বাজার হইতে উত্তম বোম্বাই আম কিনিয়া আনিয়া মনোরমাকে দিয়া বলে, "দেশ থেকে এসেছিল, আমাদের বাগানের আম।" বাঙ্গাল দেশের মেয়ে, ভাল সৌখীন কাঁথা সেলাই করিতে জানে, এবার জেলর-গৃহিণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইলে কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করিবে, বলিয়া রাখিয়াছে।

প্রায় দশ মিনিট পরে মনোরমা পানের ডিবা ও দোক্তার কৌটা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "পান ক'টা সেজে আন্‌তে দেরী হয়ে গেল, ভাই। চাকর-বাকরের সাজা পান আমার মুখে রোচে না জানই ত!"

সরোজিনী বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি বৈ কি, দিদি। কি চমৎকার যে তোমার প্যান-সাজা! যে খেয়েছে, সেই জানে। উনি কি বলেন জান? উনি বলেন, আমি এই যে কাষকর্ম-

না থাকলেও নিত্যি জেলরবাবুর বাড়ী যাই, সে কেবল গিন্নী-ঠাকরুণের সাজা পাণ খাবার লোভে। আমায় বলেন, তুমি তাঁর কাছে ঐ রকম পাণ-সাজা শিখে এস না কেন? দিও ত দিদি, দু'এক দিন দেখিয়ে।"

"আচ্ছা দেবো" বলিয়া মনোরমা মুচকি হাসিল, কারণ, নিজ হাতে পাণ সে নিজের জন্যই সাজিয়া থাকে। অতিথি অভ্যাগত ত দূরের কথা, স্বামীর পাণও সে কদাচিৎ সাজে; কিন্তু সরোজিনী অপ্রতিভ হইবে বলিয়া সে আর তাহা প্রকাশ করিল না। পাণ ও দোক্তা সেবন করিতে করিতে দুইজনে গল্প করিতে লাগিল।

দুই চারি কথার পর সরোজিনী বলিল, "ভাল মনে প'ড়ে গেল। আমাদের বাড়ীর পাশে যে উকীলবাবু আছেন না—কেদার ভট্টচায্যি—তাঁদের দেশ থেকে একজন অনাথা স্ত্রীলোক এসে রয়েছে। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, জাতে ব্রাহ্মণ। তার তিন কুলে কেউ নেই, দেশে থাকতে খেতে পেত না, এখানে এসেছে—যদি কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা রাঁধুনি-গিরি কায-কর্ম্ম জোটে। উকীলবাবুর বাড়ীতে আমি ত প্রায়ই যাই কি না, উকীলবাবুর বউ, মেয়েরাও আমাদের বাড়ী আসে যায়। তোমাদের সব কথাই আমি তাদের বলেছি ত! তাই উকীল-বাবুর পরিবার সে-দিন বল্লে, তুমি ত জেলরবাবুর বাসায় প্রায়ই যাও, জিজ্ঞাসা কোরো না তাঁদের, তাঁরা যদি মেয়েটিকে রাখেন।"

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "বিধবা ত ?"

"না, বিধবা কেন হবে ? সধবা। কিন্তু স্বামী তার থেকেও নেই। সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে চ'লে গেছে, কোনও খোঁজ-খবরই নেই।"

"কত দিন নিরুদ্দেশ হয়েছে ?"

"তা দিদি আমি জিজ্ঞাসা করিনি। পাঁচ-সাত বছর হবে বোধ হয়। না, অত হবে না—তার কোলে একটি ছেলে, তার বয়স চার বছর।"

"ছুঁড়ীর বয়স কত ?"

"আমার চেয়ে ছোটই হবে। এই—আঠারো-উনিশ বোধ হয়। বল্লে, ওটি তার প্রথম সন্তান নয়—আর একটি হয়েছিল, সেটি ছ'মাসের হয়ে মারা গেছে।"

মনোরমার মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে "আহা!" শব্দটি বাহির হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "মানুষটা নষ্ট-দুষ্ট নয় ত ?"

সরোজিনী বলিল, "তা কি ক'রে জানবো দিদি ? সে নারায়ণই জানেন। কিন্তু দেখে ত নষ্ট-দুষ্ট ব'লে মনে হয় না। খুব ঠাণ্ডা, মুখে কথাটি নেই, চোখ দু'টি সদাই ছল্‌ছল্ করছে। তা ছাড়া ধর, নষ্ট-দুষ্টই যদি হত, রাঁধুনিগিরি করতে আসবে কেন ? ভরা সোমত্ত বয়স দেখতেও মন্দটি নয় !"

"নাম কি তার ?"

"মোক্ষদা।"

"কোথায় বাড়ী বল্লে ?"

"ঐ যে উকীলবাবুদের বাড়ী যেখানে। বরিশাল জেলার কোন্ একটা গ্রাম—নামটা মনে আসূছে না।"

মনোরমা একটু ভাবিয়া বলিল, "এক দিন নিয়ে এস না তাকে সঙ্গে ক'রে—দেখি মানুষটা কেমন। কর্ত্তার মতটাও জিজ্ঞাসা ক'রে রাখি। তাকে আমরা রাখবো কি রাখবো না, সে-কথা এখন থেকে কিছু ব'লে দরকার নেই।"

সরোজিনী বলিল, "বেশ,—তা কবে আন্‌বো বল ? তাকে শুধু বল্‌বো এখন, চল এক যায়গায় বেড়িয়ে আসি।"

মনোরমা বলিল, "কাল কি পরশু যে দিন হয় নিয়ে এস।"

"বেশ, পরশুই তাকে আন্‌বো তা হ'লে।"

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথার পর সরোজিনী বিদায়গ্রহণ করিল।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে মনোরমা স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িল।

ইন্দুবাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "বামনীর কায খুঁজছে, তা বামুন ত তোমার রয়েছে, কি কর্‌বে সে ?"

মনোরমা কহিল, "রান্না-বান্নার কাযই যে তাকে দিয়ে করাতে চাচ্ছি, তা নয়। ঘর-কন্নার অন্য সব কাযও ত আছে। এই বিদেশে প'ড়ে আছি, একটা মানুষ-জন নেই, পাড়া-প্রতিবেশী নেই, দু'টো কথা কোয়েও ত বাঁচবো।"

ইন্দুবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, তোমার একটি সহচরীর দরকার, তাই বল :"

মনোরমা কহিল, "সে তুমি যাই বল। তার পর, বামুন-ঠাকুরের যদি দু'দিন অসুখ-বিসুখই হ'ল, বামুনের মেয়ে, তাকে দিয়ে স্বচ্ছন্দে কায চালিয়ে নিতে পারবো। হ'ল বা ছোট খোকাকে স্নানটা করিয়ে দিলে। এই রকম সব কায আর কি। তার পর ধর, যা সন্দেহ করছি, তাই যদি শেষে দাঁড়ায়—" বলিয়া মনোরমা লজ্জায় অবনতমুখী হইল।

ইন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে। ছোট খোকা হবার সময় কাত্তি যাই ছিল, তাই অনেক উপকার পাওয়া গিয়েছিল। আচ্ছা, তুমি ত তাকে আস্‌তে বলেছ। আসুক, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোয়ে দেখ, তার পর যা বিবেচনা হয় করা যাবে।"

৩

মোক্ষদা আসিলে, তাহাকে দেখিয়া, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মনোরমার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। সরোজিনী বলিয়াছিল, তাহার বয়স আঠারো-উনিশ, কিন্তু মোক্ষদা নিজে বলিল, তাহার একুশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, বাইশ চলিতেছে। পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে হইলেও, কথায়-বার্ত্তায় বেশ সভ্য-ভব্য, আর, একটু লেখাপড়া-জ্ঞানও আছে। বলিল, বাল্যকালে সে স্কুলে পড়িয়াছিল, চতুর্থমান পর্য্যন্ত পড়া হইলে তার বিবাহ হয় এবং সেজন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। বাঙ্গালার সঙ্গে তিনখানা ইংরাজী কেতাবও সে পড়িয়াছিল, মিশ্রভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক কষিয়া

শঃ শাঃ শুঃ কষিতেও সুরু করিয়াছিল, তা ছাড়া ভূগোল-প্রবেশ, ইতিহাস-পাঠ ইত্যাদিও পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন সে-সব আর তাহার মনে নাই। ছেলেটিও তার বেশ শিষ্ট-শান্ত। কোনওরূপ অন্যায়-আব্দার নাই, দৌরাত্ম্য নাই।

মনোরমা তাহাকে খোরাক-পোষাক ও মাসিক চার টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছে। মনোরমা বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে মোক্ষদা বলিয়াছিল, "আমি আর কি বল্‌বো—আপনি বিবেচনা ক'রে যা দেবেন, তাই আমার যথেষ্ট। ভদ্রঘরে আশ্রয় পেলাম, এই আমার পরম সৌভাগ্য।"

মোক্ষদার কাপড়-চোপড়ের দুরবস্থা দেখিয়া মনোরমার বড় দুঃখ হইল। স্বামীকে বলিয়া ঠিকাদারবাবুর দ্বারা মোক্ষদা ও তাহার পুত্রের জন্য আবশ্যক বস্ত্রাদি আনাইয়া দিল। ঠিকাদার-বাবু যেরূপ সস্তায় জিনিষপত্র কিনিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না।

মোক্ষদা মনোরমার হাতের কায কাড়িয়া নিজে করে। নিজ পুত্র অপেক্ষা মনোরমার পুত্র দুইটিকে অধিক যত্ন করিয়া থাকে। কর্ত্রী-ঠাকুরাণীকে সে দিদি এবং কর্ত্তাকে দাদাবাবু বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—যদিও কর্ত্তার সামনে সে বাহির হয় না, তাঁহার সঙ্গে কথা কহা ত দূরের কথা।

আজ রবিবার। রবিবার বিকালে ইন্দুবাবু আফিস যান না, এই সময় তাঁহার বাজার দর যাচাই করিবার জন্য সহরে যাইবার কথা। কাছাকাছি কোথাও ঠিকা-গাড়ীর আড্ডা

যাই, গাড়ীর আবশ্যক হইলে সেই সহরে লোক পাঠাইতে হয়। ভৃত্য গিয়াছে গাড়ী আনিতে। বড় ছেলে নগেন ম্যাচ দেখিতে গিয়াছে। ইন্দুবাবু স্ত্রীর সহিত পশ্চাতের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, দেখ, ঐ পুকুরের পাড়ে নিমগাছের তলায় ছোক্‌রা-গোছ একজন কয়েদী দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌ছ?"

মনোরমা বলিল, "হ্যাঁ, কে ও?"

"ও একজন সাধারণ কয়েদী নয়, ও বি-এ পাস।"

"বি-এ পাস? বল কি? চুরি করেছিল না কি?"

"না, চুরি নয়, ডাকাতী করেছিল বলা যায়। ও যে একজন মস্ত স্বদেশী।"

"কোনও স্বদেশী ডাকাতী বুঝি?"

ইন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ডাকাতীও কি স্বদেশী আর বিলিতী হয়?"

"তা নয়। দেশ-উদ্ধারের জন্যে টাকা সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে যে ডাকাতী, তাকেই আমি স্বদেশী ডাকাতী বল্‌ছিলাম। ওর নাম কি? কোথায় ডাকাতী করেছিল?"

"ওর নাম শরৎ বাঁড়ুয্যে। কোথায় ডাকাতী করেছিল, তা এখন আমার মনে নেই, কিন্তু সে সময় খবরের কাগজে আমি ওর মোকর্দ্দমার কথা পড়েছিলাম।"

"কত দিনের কথা?"

"বছর তিনেক হবে, কিম্বা কিছু বেশী। আমরা তখন

পাটনায়। আগে ও আলিপুর জেলে ছিল—এই মাস-দেড়েক হবে এখানে এসেছে।”

“কত দিন পরে ওর খালাস হবে?”

“পাঁচ বছর জেল হয়েছিল, এখনও বুঝি বছর-খানেক বাকী আছে।”

যাহার বিষয়ে এই আলোচনা হইতেছিল, এতক্ষণে সে লোক অদৃশ্য হইয়াছিল। মনোরমা বলিল, “আহা, ব্রাহ্মণের ছেলে, উচ্চশিক্ষিত, দেখ দেখি একবার কর্ম্মের ভোগ! কেন বাপু, তোরা এ-সব করিস্? কি কায এখানে ওকে করতে হয়? আপিসের কায করে ত? লেখাপড়া-জানা কয়েদী যখন!”

ইন্দুবাবু বলিলেন, “সাধারণতঃ লেখাপড়া-জানা কয়েদী হ'লে তাকে আপিসের কাযই দেওয়া হয় বটে, কিন্তু এ যে অসাধারণ। গভর্ণমেণ্টের হুকুম নেই। ওকে বাগানের কাযে দিয়েছি, বেশী খাটতে হয় না।”

প্রত্যেক জেলের সংলগ্ন একটা করিয়া বাগান থাকে, সেখানে জেলের খরচের জন্য শাক-সব্জী তরকারি-পাতি উৎপন্ন করা হয়। জেলের কয়েদীরাই সে-সব বাগানের কায করিয়া থাকে।

এ সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী আসিয়াছে। ইন্দুবাবু প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

রাত্রিতে আহারাদির পর শয়ন করিয়া মনোরমা স্বামীকে বলিল, “ওগো, দেখ, আমাদের মোক্ষদা ঐ ছেলেটির সম্বন্ধে

অনেক কথা জানে। তোমাতে আমাতে যখন কথা হচ্ছিল, ঘরের ভিতরে পাণ সাজতে-সাজতে ও ব'সে শুনেছিল।"

"কোন্ ছেলেটি?"

"ঐ যে তোমার বি-এ পাস করা ডাকাত, শরৎ মুখুয্যে না কি।"

"শরৎ বাঁড়ুয্যে।"

"যখন ঢাকায় ওর মোকর্দ্দমা হয়েছিল, খবরের কাগজে সব কথা মোকদ্দা পড়েছিল। বল্লে, ও ত ডাকাতী করেনি, গভর্ণমেণ্ট অন্যায় ক'রে ওকে জেলে পুরেছে। বি-এ পাস ক'রে ঢাকা জেলার কোন্ ইস্কুলে নাকি ও হেড-মাষ্টারি করত। সেখানে ওরা একটা সমিতি করেছিল। সেই গ্রামের আর আশে-পাশের গ্রামের অনেক ছোঁড়া সেই সমিতির মেম্বর ছিল। ও ছিল সেই সমিতির সভাপতি। কাছে একটা বড় গ্রামে কি সাহা নাম বল্লে, তার কাপড়ের দোকান ছিল। ওরা বার-বার তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিলিতী কাপড় আমদানী ক'রে দোকানে বিক্রী করছিল। টাকার মহাজনীও করতো। গরীব চাষাদের বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে ক্রমে তাদের জোৎ-জমা নীলেম ক'রে নিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করতো, এই রকমে সেই সাহা পোড়ারমুখো অনেক টাকা জমিয়েছিল। স্বদেশীওয়ালারা কত বারণ করে, তবু সে শোনে না। তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার হিসেবেও বটে, দেশের কাযে লাগাবার জন্তে টাকা-সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও বটে, সমিতির লোকরা নৌকো ক'রে গিয়ে

এক রাত্রে সেই সাহা-মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতী করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়ে। এক জন মহারাণীর সাক্ষী হয়ে সব কথা প্রকাশ ক'রে দেয়। ঐ শরৎ বাঁড়ুয্যে, সেই সমিতির সর্দার ছিল কি না, তাই গভর্ণমেণ্ট রাগে ওকে সুদ্ধ জেল দিয়েছে, নইলে ও নিজে ডাকাতী করেনি, ডাকাতদের সঙ্গে ছিলও না।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিও খবরের কাগজে ঐ রকমই যেন পড়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে। তোমার সহচরী ঐ দেশেরই লোক বুঝি ?"

"না না, ওর বাপের বাড়ী শ্বশুরবাড়ী দুই-ই ত বরিশাল জেলায়। এ হ'ল ঢাকা জেলার ঘটনা, ও খবরের কাগজে সেই সময় পড়েছিল বল্লে।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "আমিও ত পড়েছিলাম, আমার ত মনে ছিল না। ওর খুব স্মরণ-শক্তি ত !"

মনোরমা বলিল, "খবরের কাগজ পড়ার ওর ভারি সখ কি না। তোমার যে ইংরিজি কাগজ আসে, ও ত পড়তে পারে না। একদিন বল্‌ছিল, দাদাবাবু একখানা বাংলা কাগজ নেন না কেন, তা হলে আমরাও পড়তে পারি।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "একখানা ইংরিজি কাগজ নিচ্ছি, আবার একখানা বাংলা—এত টাকা কোথায় ?"

মাসখানেক পরে, ইন্দুবাবুর পাচক ব্রাহ্মণ তিন মাসের ছুটী চাহিল। দেশে তার শ্বশুর নাকি মারা গিয়াছে, কন্যাই তার একমাত্র সন্তান, জ্যোৎজমী যাহা কিছু শ্বশুর রাখিয়া গিয়াছে, সমস্তই তাহার প্রাপ্য, কিন্তু দুষ্টপ্রকৃতি জ্ঞাতিরা সে সকল অপর দখল করিবার চেষ্টায় আছে। এই বলিয়া, কয়েকদিন পরেই বামুন-ঠাকুর দেশে রওয়ানা হইল।

ঠিকাদারবাবুর সাহায্যে অন্য একজন পাচক সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। পাকশালার ভার পড়িল মোক্ষদার উপর। মনোরমাও তাহাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করে।

এইরূপ কয়েকদিন চলিলে, ইন্দুবাবু একদিন দ্বিপ্রহরে আহারে বসিয়া বলিলেন, "ওগো দেখ, সেই স্বদেশী কয়েদী শরৎ বাড়ুয্যের সঙ্গে আজ আমার অনেক কথা হ'ল।"

"কি কথা হ'ল ?"

"সে আমায় বল্‌ছিল,'মশাই,জেলের অন্ন খেয়ে খেয়ে আমার ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেল ! বাড়ীর কায-কর্ম্ম করবার জন্যে আপনার ত দু'জন কয়েদী সরকার থেকে বরাদ্দ আছে, আমায় যদি সেই একজনের যায়গায় নিযুক্ত করেন ত একবেলা দু'টো খেয়ে বাঁচি।' —আমি বল্লাম, 'তুমি বি-এ পাস, তুমি কি জলতোলা, বাসনমাজা, এ-সব নোংরা কায করতে পারবে ? তা ছাড়া, তুমি বামুনের

ছেলে, এঁটো বাসনই বা তোমায় দিয়ে মাজাই কি ক'রে? রাঁধতে জান?' সে বল্লে, 'কেন আপনার বামুন ত আছে।'—জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি ক'রে জানলে আমার বামুন আছে?' সে বল্লে, 'ঐ ঝাধুনী আর গুরুচরণ যারা রোজ আপনার বাসায় কায করতে যায়, তারা বলে যে!' আমি বল্লাম, 'বামুন ছিল, পালিয়েছে। রাঁধতে জান ত বল, গুরুচরণের বদলে তোমাকে নিই।' সে বল্লে, 'আজ্ঞে, রান্না-বান্না মোটামুটি যে না জানি, তা নয়। মা-ঠাকরুণ একটু আধটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিলেই কায চালিয়ে নিতে পারবো।' আমি তাকে হেসে বল্লাম, 'আচ্ছা, দেখি বিবেচনা ক'রে।'—কি করবো, আন্‌বো তাকে?"

এই বি-এ পাস কয়েদী সম্বন্ধে মনোরমার মনে কিছু কৌতূহল ছিল; তা ছাড়া ব্রাহ্মণ-সন্তান ডাকাতী না করিয়াও কারাক্লেশ ভোগ করিতেছে জানিয়া তাহার উপর সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। তাই সে স্বামীর প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইল।

ইন্দুবাবু বলিলেন, "ও যে বলেছে, ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে, তুমি তা পারবে ত?"

মনোরমা বলিল, "সেই ত মুস্কিল। ওর সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা করবে যে!"

"কেন? কাল যদি একজন নতুন রাঁধুনী-বামুন আসে, তুমি কি তার সঙ্গে কথা কইবে না?"

মনোরমা বলিল, "কিন্তু, সে ত বি-এ পাস হবে না!"

ইন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি ভাগ্যিস্ আমি বি-এ পাস

করিনি! তা হলে ফুলশয্যের রাত থেকে আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে কথাই কইতে না বল ?”

মনোরমা লজ্জিত-হাসি হাসিয়া বলিল, “কি যে বল তুমি, তার ঠিক নেই। তুমি আর ও সমান ?”

৮

দুই দিন পরে শরৎ আসিয়া, স্নান করিয়া মনোরমার পাক-শালায় প্রবেশ করিল। তাহার কথাবার্ত্তা, চালচলন অত্যন্ত বিনীত ও ভদ্র। মনোরমাকে গোড়াতেই সে মাতৃসম্বোধন করায়, তাহার সম্বন্ধে সঙ্কোচের ভাব মনোরমার মন হইতে অনেকটা দূর হইল। তথাপি মনোরমা মোক্ষদাকে বলিল, “যাও না ভাই, কি কি রাঁধতে হবে, বামুন-ঠাকুরকে ব’লে দাও গে না।”

মোক্ষদা জিভ্ কাটিয়া বলিল, “না দিদি, আমি পারবো না ওর সঙ্গে কথা কইতে। তুমি গিন্নী-বান্নি মানুষ, তুমি যাও।”

অবশেষে মনোরমা গিয়া বামুন-ঠাকুরকে রান্নার বিষয় বলিল। আরও বলিল, “আমার বড় ছেলে নগেন দশটার সময় খেয়ে ইস্কুলে যাবে। বাবু খেতে বসবেন সাড়ে এগারোটায়।”

বামুন-ঠাকুর বলিল, “তা হলে মা, বড়বাবুর ভাত ক’টা আগে চড়িয়ে দেবো এখন, কর্ত্তাবাবুর আর অন্য সবাইকের ভাত শেষে রাঁধবো।”

“তাই কোরো”—বলিয়া মনোরমা চলিয়া আসিল।

মাঝে মাঝে মনোরমা গিয়া আধঘোমটা দিয়া রান্নাঘরের

দ্বারের কাছে দাঁড়াইল, দেখিল, বামুন-ঠাকুরের কার্য্যে কোনওরূপ ভুল হইতেছে না।

বামুন-ঠাকুর দুই তিনবার শয়ন-ঘরের নিকট আসিয়া ঘড়ি দেখিয়া গেল। নগেনকে যথাসময়েই সে ভাত দিল, যদিও সব রান্না তখনও তাহার হয় নাই।

ইন্দুবাবু আপিস হইতে ফিরিয়া, স্নান করিতে যাইবার সময় রান্না-ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া, সকৌতুকে একবার বি-এ পাস বামুন-ঠাকুরের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কি হে শরৎ বাবু, রান্নার তোমার কত দূর ?"

শরৎ বলিল, "আজ্ঞে, আমায় আর বাবু ব'লে লজ্জা দেন কেন ? আর সব রান্নাই আমার হয়ে গেছে, ভাতটা চড়িয়েছি, আপনি স্নান করুন, ততক্ষণ ভাতও হয়ে যাবে।"

খাইতে বসিয়া, অর্দ্ধেক খাওয়া হইলে ইন্দুবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি বামুন-ঠাকুর নিজে নিজেই রেঁধেছে ? তুমিই বোধ হয় দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছ ওকে ?"

মনোরমা বলিল, "আমি কিছুই দেখিয়ে দিই নি।"

"তবে খোক্‌দা দেখিয়ে দিয়েছে বোধ হয়।"

"ও ত রান্না-ঘরের ত্রিসীমানায় যায় নি। কেন, বামুনঠাকুর রেঁধেছে কেমন ?"

"বেশ রেঁধেছে গো!"—বলিয়া ইন্দুবাবু শরৎকে ডাকাইলেন।

শরৎ আসিয়া অনতিদূরে বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, "আর কি এনে দেবো ?"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "আর কিছু এনে দিতে হবে না। কিন্তু শরৎ, ঠিক ক'রে বল দিকিনি, সত্যিই কি তুমি বি-এ পাস ?"

শরৎ কিছু উত্তর করিল না, শুধু একটু হাসিল।

ইন্দুবাবু আবার বলিলেন, "তুমি বলেছিলে মোটামুটি এক রকম রাঁধ্‌তে তুমি জান। এ ত মোটামুটি রকম নয়, এক্সপার্ট হাতের রান্না! এ তুমি শিখ্‌লে কি ক'রে ?"

শরৎ বলিল, "আজ্ঞে, আমি যখন মাষ্টারি করতাম, তখন ছেলেদের নিয়ে আমি একটা বোর্ডিং বলুন, আশ্রম বলুন, খুলে-ছিলাম। আমরা আশ্রমই বল্‌তাম। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমরা অনুসরণ করতাম, নিজের নিজের সব কায আমরা নিজেরাই করতাম—এমন কি, বাসনমাজা, ঘর-ঝাঁড় দেওয়া পর্য্যন্ত। কোনও চাকর বাকর আমাদের ছিল না। প্রথম প্রথম পাকপ্রণালী হাতের কাছে রেখে রোজই আমি নিজেই রাঁধ্‌তাম, ছেলেরা পালাক্রমে আমার সাহায্য করত। ক্রমে তারাও সব শিখে ফেল্লে। তার পর, মাঝে মাঝে রাঁধতাম, পালা ছিল। হাতে-কলমে শেখা আর কি।"

ইন্দুবাবু হাসিতে লাগিলেন। মনোরমা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে বামুন-ঠাকুরের পানে চাহিতে লাগিল। ইন্দুবাবু বলিলেন, "তোমার খালাসের বুঝি আর এক বছর বাকী আছে ?"

শরৎ বলিল, "দশ মাস।"

"দশ মাস ? হয় ত শেষ গুড্‌কণ্ডাক্টের (সচ্চরিত্রতার) জন্যে

এক মাস তুমি রেহাই পাবে। তবে তুমি স্বদেশী কয়েদী, বলা যায় না, এ অনুগ্রহ গভর্ণমেণ্ট তোমায় না-ও কর্‌তে পারেন। আপাততঃ আমি ব্যবস্থা করেছি, সারাদিন তুমি আমার বাসাতেই থাকবে, ও-বেলা তখন খাবার-টাবারগুলো ক'রে দিয়ে পাঁচটার সময় জেলে ঢুকবে। সারাদিন ব'সে তুমি কি কর্‌বে? তুমি তোমার আত্ম-জীবন-চরিত লেখ, খালাস হ'য়ে সে বই তুমি ছাপাবে। স্বদেশীর যে রকম হিড়িক, তোমার বই হু-হু করেই বিক্রী হবে। যত দিন আবার কায-কর্ম্ম একটা না যোটাতে পার, সেই বইয়ের আয়ে তোমার চ'লে যাবে।"

শরৎ বলিল, "যে আজ্ঞে, আপনার এ পরামর্শ ভাল।"

পরদিন বড় খোকা (নগেন্দ্র) ইস্কুল হইতে ফিরিয়া একখানা বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক্ (খাতা) বামুন-ঠাকুরকে দিল। মা তাকে পয়সা দিয়াছিলেন।

৬

তিন মাস অতীত হইল, কিন্তু ইন্দুবাবুর বামুন-ঠাকুর ফিরিয়া আসিল না। মনোরমা বলিল, "ওরা ত ঐ রকমই করে। একবার ছুটী নিয়ে দেশে গেলে আর সহজে আস্‌তে চায় না।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে তার বোধ হয় অবস্থা ফিরে গেছে, আর চাকরী করবার দরকার নেই।

কায ত চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু শরৎও বোধ হয় আর বেশী দিন এখানে থাকবে না।"

"বদ্‌লির হুকুম এসেছে না কি?"

"না, আসেনি এখনও। কিন্তু আস্‌তে কতক্ষণ? মেয়াদী কয়েদীকে গভর্ণমেন্ট বেশী দিন ত এক জেলে রাখে না।"

"এখানে কত দিন হ'ল ওর?"

"মাস-ছয়েক হ'ল বুঝি।"

"ওর মেয়াদের ত আর ছ'মাস মাত্র বাকী আছে। বেশ কায-কর্ম্ম করছিল, অতি ঠাণ্ডা স্বভাব, সচ্চরিত্র—বাকী ছ'টা মাস এখানে ও থাকলেই বেশ হ'ত।"

এই তিন মাসে শরৎ সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য কয়েদী যাহারা জেলরবাবুর বাড়ীতে আসিয়া গৃহকার্য্য করিবার হুকুম পায়, একটা দুর্ল্লভ সুযোগ তাহারা লাভ করে,—লুকাইয়া তামাক খাইতে পায়। বাড়ীর চাকর-বাকরের সঙ্গে ভাব করিয়া, এই সুবিধাটুকু ভোগ করিয়া লয়। কিন্তু জেলে ত তামাক খাবার কোনই উপায় নাই। শরৎ তামাক, সিগারেট, বিড়ি কিছুই খায় না। এমন কি, আহারান্তে পাণ পর্য্যন্ত নয়। প্রথম দিন শরতের আহার হইয়া গেলে মনোরমা ভৃত্য-হস্তে দু'টি পাণ তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু শরৎ বলিয়াছিল, "মাকে বল, পাণ ত আমি খাইনে। দয়া ক'রে দু'টো সুপুরি-লবঙ্গ যদি দেন ত খাই।" বড় খোকা, ছোট খোকা, এমন কি, মোক্তার ছেলেটির সঙ্গে পর্য্যন্ত শরতের অত্যন্ত ভাব। বড় খোকাকে

শরৎ কত দেশ-বিদেশের গল্প বলে, বিশেষ নেপোলিয়নের যুদ্ধের গল্প এমন সুন্দর করিয়া বলিতে পারে যে, শুধু বড় খোকা নহে, মনোরমা, মোক্ষদাও শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। মনোরমা ত এখন শরৎকে দেখিয়া মাথায় কাপড় পর্য্যন্ত দেয় না। মনোরমা বলে, "ও আমার বড় ছেলে।" মোক্ষদা মাথায় কাপড় দেয় বটে, কিন্তু শরতের সঙ্গে রীতিমত কথা কহে। পূর্ব্বে ইন্দুবাবু মনোরমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার সহচরীটাকে শরতের কাছে বেশী যেতে-টেতে দিও না। দু'জনেরই পুরো সোমত্ত বয়স, জান ত, চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, ঘি আর আগুন—একসঙ্গে রাখবে না।"

মনোরমা বলিয়াছিল, "সে বুদ্ধি কি আমার নেই? হাজার হোক, গেরস্তর মেয়ে আমাদের আশ্রয়ে রয়েছে! ওর ভাল-মন্দ আমাকেই দেখতে হবে ত!"

কিন্তু অল্পে অল্পে এ নিষেধ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। একদিন মোক্ষদাকে শরতের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া ইন্দুবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মোক্ষদা এখন শরতের সঙ্গে কথা কয় দেখ্‌ছি।"

মনোরমা বলিয়াছিল, "এক বাড়ীতে থেকে কথা না কইলে চলে? কুটনো কুটে দেওয়া, বাটনা বেঁটে দেওয়া, রান্না-বান্নার যোগাড় ক'রে দেওয়া, সবই ত এখন মোক্ষদাই করে। ওগো, শরৎ সে ছেলে নয়, দেবচরিত্র পুরুষ। ওরা দু'জনে রান্নাঘরে ব'সে কায-কর্ম্ম করছে, কতদিন এমন আমি আচম্কা গিয়ে

পড়েছি, কখনও দু'জনকে কথাবার্ত্তা কইতেও দেখিনি। কাঠের মুখ। কেউ কারু পানে তাকায়ও না।"

যে-দিন স্ত্রীর সহিত ইন্দুবাবুর শরতের অন্ত জেলে বদ্‌লি হইবার প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার এক সপ্তাহ পরে তিনি আপিস হইতে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, শরতের বদ্‌লির হুকুম এসেছে।"

"কোথা ?"

"বক্সার সেন্‌ট্রাল জেলে।"

"কবে যেতে হবে ?"

"পাঁচ দিন পরে।"

ইন্দুবাবু শরৎকে ডাকিয়াও খবরটা দিলেন। শুনিয়া সে মুখখানি চুপ করিয়া রহিল।

শরতের বদলির সংবাদে বাড়ীসুদ্ধ সকলেই দুঃখিত।

ইন্দুবাবু বলিলেন, "ঠিকাদারবাবুকে বলি, যদি জানাশুনো একটা ভাল বামুন যোগাড় ক'রে দিতে পারেন।"

শেষ দিন কর্ম্ম করিয়া বিকালে জেলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শরৎ মনোরমাকে বলিল, "মা, এ-ক'মাস আপনার বাড়ীতে বড় সুখেই ছিলাম। যেন বাড়ীর ছেলের মত ছিলাম—আমি যে জেল খাটছি, তা আমার মনেই হত না। কাল বেলা ন'টার সময় আমায় নিয়ে যাবে। যাবার আগে একবার আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে যেতে চাই। আপনি বাবাকে ব'লে হুকুমটা করিয়ে দেবেন, নইলে ত সে সময় আমাকে আসতে দেবে না।"

মনোরমা সজল-নয়নে স্বীকৃত হইল।

পরদিন যথাসময়ে শরৎ আর আসিল না।

আজ মোক্ষদাই রাঁধিবে। তবে আজ ফতেহাদোয়াজ দাহানের ছুটী বলিয়া নগেনের স্কুল নাই। রান্নার তাড়াতাড়ি নাই।

সাতটার সময় যখন জেলরবাবু আপিসে যাইতেছিলেন, তখন মনোরমা তাঁহাকে শরতের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল। ইন্দুবাবু বলিলেন, "আমি গিয়েই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ইন্দুবাবু চলিয়া গেলে মনোরমা মোক্ষদাকে বলিল, "তুমি তা হ'লে স্নান-টান সেরে নিয়ে রান্নার যোগাড় দেখ। তোমার স্নান হয়ে গেলে আমিও স্নান ক'রে রান্নাঘরে যাব।"

৭

অন্য দিন অপেক্ষা আজ একটু সকালেই—সাড়ে দশটা না বাজিতেই, ইন্দুবাবু আপিস হইতে বাড়ী ফিরিলেন। বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় মনোরমা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ইন্দুবাবু বলিলেন, "কি গো, কোথায় ছিলে?"

"রান্না করছিলাম।"

"কেন, মোক্ষদা?"

মনোরমা মুখখানি গম্ভীর করিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল।

তার পর বলিল, "ওর হাতে আমাদের আর খাওয়া চল্‌বে না।"

"কেন, কি হয়েছে ?"

মনোরমা থামিয়া থামিয়া বলিল, "ও—খারাপ—মেয়ে !"

ইন্দুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ ? সে কি ? কে বল্লে ? কোথা শুন্‌লে তুমি ?"

"আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। ভাত চড়িয়ে দিয়ে এসেছি, এখনও ফুটতে দেরী আছে। সব কথা বলি, শোন।"—বলিয়া মনোরমা একখানা চেয়ারে বসিল।

ইন্দুবাবু শঙ্কিত-নেত্রে স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি, বল দেখি।"

তখন মনোরমা বলিতে লাগিল, "তুমি আপিস যাবার সময়, শরৎকে পাঠিয়ে দিতে তোমায় বল্লাম ত ? সে আটটার সময় আমায় প্রণাম করতে এল। মোক্ষদা তখন স্নানের ঘরে, আমি এই ঘরে ব'সে তেল মাখছি। শরৎ এসে আমার কাছে বস্‌ল। সে থাক্‌তে থাকতেই মোক্ষদা স্নানের ঘর থেকে বেরুল, বেরিয়ে ওদিকে চ'লে গেল। তার পর শরৎ আমায় প্রণাম ক'রে বিদায় নিলে, আমি স্নানের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করলাম। স্নান করতে গিয়ে দেখি, আমার গামছাখানা নেই। আবার বেরিয়ে, গামছা খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরের বাইরে দেখি, শরৎ আর মোক্ষদা দু'জনে জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মোক্ষদার মাথা শরতের কাঁধের উপর, দু'জনে একবারে জ্ঞানশূন্য। তার

পর মোক্ষদার মাথাটা শরৎ তুলে, তার মুখে চুমো খেয়ে, চোখ মুছতে মুছতে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মনে করেছিল, গিন্নীমাগী স্নানের ঘরে বন্ধ, কেউ আমাদের দেখ্‌তে পাবে না।"

"তুমি যে দাঁড়িয়ে আছ, তা শরৎ দেখ্‌লে ?"

"না।"

"আর মোক্ষদা ?"

"মোক্ষদা আমায় দেখ্‌লে বৈ কি—একটু পরেই।"

"তুমি কি বল্লে ?"

"রাগে আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্ব'লে যাচ্ছিল, আমি দাঁড়িয়ে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিলাম। মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুচ্ছিল না। কোনও রকমে শুধু বল্লাম, 'মোক্ষদা, তুমি আর রান্নাঘরে ঢুকো না।'—ব'লেই আমি গামছাখানা নিয়ে স্নানের ঘরে গেলাম। প্রায় পনেরো মিনিট স্নান করতে পারলাম না, কাঠের মূর্ত্তির মত ব'সে রইলাম। তার পর স্নান সেরে মাথা মুছতে মুছতে ও-ঘরে গিয়ে দেখি, কয়েদীদের নিয়ে যাবার জন্যে জেলের গাড়ী ফটকে দাঁড়িয়ে আছে, আর মোক্ষদা জানালার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে ফটকের পানে চেয়ে আছে। আমি যে ঢুকেছি, তা বিবির হুঁস পর্য্যন্ত নেই।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "অ্যাঁ, তুমি দেখে ফেলেছ জেনেও ? পরেও লজ্জা-সরম একেবারে বিসর্জ্জন ?"

মনোরমা বলিল, "ওগো, বুঝছ না, ধরা প'ড়ে হু'কাণ-কাটা

হয়ে গেল কি না! এক-কাণ-কাটা যায় গাঁয়ের বা'র দিয়ে, দু'কাণ-কাটা যায় গাঁয়ের ভিতর দিয়ে।"

"কোথা সে এখন? পালিয়েছে বোধ হয়?"

"পালাবে কেন? নিজের বিছানায় শুয়ে, বিরহিণী বোধ হয় বিরহের কান্না কাঁদছেন।"

ইন্দুবাবু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকার পর থামিয়া থামিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "সংসারে মানুষ চেন্‌বার উপায় নেই! ঐ পাজিটাকেই তুমি একদিন বলেছিলে—দেবচরিত্র পুরুষ! আর তাও ঐ মোক্ষদারই সম্বন্ধে। আর মোক্ষদাও যে এমন ভিজে বেড়ালটি, তা ত একদিনের জন্যেও সন্দেহ হয় নি! ছি ছি ছি, ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে এ কি কাণ্ড! দুপুর বেলা আমি এ-ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুই। তুমিও মাঝে মাঝে সহরে বন্ধুবান্ধবের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছ। দিব্যি সুযোগটি পেয়েছিল ওরা। ছি ছি ছি! চুলোয় যাক্! এখন কি করা যায়, বল দেখি?"

মনোরমা বলিল, "ঝাটা মেরে বিদায় করা ছাড়া আর কি কর্‌বার আছে? তুমি স্নান ক'রে নেও, আমার ভাতও বোধ হয় হয়ে এল।"

আহারান্তে ইন্দুবাবু শয্যায় বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। তামাকটা শেষ হইলেই শয়ন করিবেন।

মনোরমা মোক্ষদার ভাত বাড়িয়া অবহেলাভরে তাহার ঘরে থালাখানা ফেলিয়া আসিয়া, স্বামীর পাতে নিজে খাইতে বসিল।

ইন্দুবাবু তামাকটা শেষ করিয়া, কি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইবেন একটা বই-টই খুঁজিতেছিলেন, এমন সময় বড় খোকা একখানা খাতা হাতে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবা, শরৎ-দা তার আত্ম-জীবনীখানা ফেলে গেছে।"

ইন্দুবাবু অন্য বহি না খুঁজিয়া, কৌতূহলবশতঃ সেইখানা হাতে লইয়াই শয়ন করিলেন। প্রথমে শেষটা দেখিলেন, সমাপ্ত হইয়াছে কি না। দেখিলেন, সমাপ্ত হয় নাই, ঢাকা জেলায় তাহার গেরেপ্তারের কথা পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। পৃষ্ঠা উল্‌টাইয়া এখানে সেখানে দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, একটা পরিচ্ছেদের শিরোনামা রহিয়াছে—"আমার বিবাহ।" সেই পৃষ্ঠাতেই রহিয়াছে, অমুক গ্রামের অমুকের কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরীর সহিত আমার বিবাহ হইল।

পড়িয়াই তাঁহার মনে হইল, এই মোক্ষদাই নহে ত? পড়িতে পড়িতে শেষ দিকে দেখিলেন, গ্রেপ্তারের সময় দেশে স্ত্রী তাহার গর্ভবতী ছিল। তারিখ হিসাব করিয়া দেখিলেন, এই মোক্ষদার পুত্রের সহিত বয়স মিলিয়া যায়।

অবাক্ হইয়া ইন্দুবাবু বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় মনোরমা আহারান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দুবাবু বলিলেন, "ওগো, মোক্ষদাকে একবার এখানে ডাক ত।"

"কেন?"

"বিশেষ দরকার। এক মুহূর্ত্ত দেরী কোরো না।"

মনোরমা মোক্ষদার ঘরে গিয়া দেখিল, সে যেমন শুইয়া ছিল,

তেমনই শুইয়া আছে, তাহার ভাত যেমন তেমনি পড়িয়া আছে। কর্ত্তার জরুর তলব মনোরমা কঠোর-স্বরে তাহাকে জানাইল।

কাঁদিতে কাঁদিতে মনোরমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোক্ষদা ঘোমটা দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোক্ষদা, ঐ শরৎ কয়েদী কি তোমার কেউ হয়?"

মোক্ষদা চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার স্বামী।"

"তুমি তা হ'লে এখানে হঠাৎ এসে পড় নি। তোমার স্বামী এখানে বদলি হয়ে এসেছে জেনেই তুমি এসেছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া মোক্ষদা যাইবার উপক্রম করিল।

ইন্দুবাবু কম্পিত-স্বরে বলিলেন, "মোক্ষদা, অন্যায় সন্দেহ করবার জন্তে তুমি আমাদের মাফ কর।"

মোক্ষদা গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া ইন্দুবাবুকে প্রণাম করিল।

মনোরমা সংশয়ভরে জিজ্ঞাসু-নয়নে স্বামীর পানে চাহিল। ইন্দুবাবু চক্ষু নত করিয়া বলিলেন,"মোক্ষদা সত্যি কথাই বলেছে।"

মনোরমা তখন "চল চল" বলিয়া আদর করিয়া মোক্ষদার হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গিয়া, জোর করিয়া ভাতের থালার কাছে বসাইল।

পরে জানিতে পারা গেল, বহু দিন স্বামীর অদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাকে মাঝে মাঝে শুধু যদি চোখের দেখা দেখিতে পায় এই আশায়, জেলখানার কোনও বাবুর

বাড়ীতে চাকরি করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই যোক্ষদা এ সহরে আসিয়াছিল। প্রতিবেশী ঠিকাদারবাবুর স্ত্রীর এ বাড়ীতে যাতায়াত আছে শুনিয়া, সে হাতে স্বর্গ পাইয়াছিল।

অবশ্য এতটা সে আশা করে নাই যে, যে বাড়ীতে কর্ম্মে নিয়োজিত হইবে, তার স্বামীও সেই বাড়ীতে প্রতিদিন আসিবেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার পর্য্যন্ত সুযোগ পাইবে।

মনোরমা বলিল, "দেখ, একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।"

"কি ?"

"শরৎ সেই যে তোমায় বলেছিল, জেলের অন্ন খেয়ে আমার প্রাণ গেল, আপনার বাড়ী আমি রাঁধ্‌বো, তার কারণ আছে। যোক্ষদা প্রায়ই পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জেলের উঠান দেখ্‌তো। আমি ভাবতাম, বুঝি তামাসা দেখ্‌ছে। তখন কি জানি, ও স্বামীকে দেখ্‌ছে। শরৎও পাঁচ দিন ওকে দেখে থাকবে। তাই এ বাড়ীতে কায করবার জন্তে ছোঁড়ার এত আগ্রহ হয়েছিল।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "তাই সম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্য সংযম ওদের। তিন মাস ছিল দু'জনে এক বাড়ীতে, অথচ দুজন ভিনটি ভিন্ন—"

মনোরমা বলিল, "সত্যি !"

মনোরমার ছেলে হওয়া পর্য্যন্ত যোক্ষদা রহিল। বস্তুতঃ জেল হইতে খালাস পাইয়া শরৎ যখন স্ত্রীকে লইতে আসিল, মনোরমার ছেলে তখন দুই মাসের হইয়াছে।

পারাশষ্ট—আইনের গল্প

(১) মাতঙ্গিনীর কাহিনী

ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী এলোকেশী, তারকেশ্বরের মোহান্তের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়াছিল বলিয়া, এলোকেশীর স্বামী তাহাকে খুন করিয়াছিল। সেই ব্যাপার লইয়া একদিন বাঙ্গালা দেশে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। সে সম্বন্ধে কত ছড়া কত গান উঠিয়াছিল, গ্রামে গ্রামে ভিখারীরা সেই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। এলোকেশীর মত না হউক, মাতঙ্গিনীর ব্যাপারও এক সময় বাঙ্গালা-দেশকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। মাতঙ্গিনী অথবা তাহার জার অথবা দুইজনে মিলিয়া, মাতঙ্গিনীর স্বামীকে হত্যা করিয়াছিল। তাহার জার পলাইয়াছিল—পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারে নাই। মাতঙ্গিনীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়।

এই ঘটনাটি, বিখ্যাত সাহিত্যিক কৃষ্ণনগরনিবাসী রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুরের মুখে যেমন শুনিয়াছি, নিম্নে তাহাই বর্ণনা করিলাম।

মাতঙ্গিনীর স্বামীর (নামটি শুনি নাই) বাস ছিল নদীয়া জেলার কোনও এক পল্লীগ্রামে। সংসারে কেবল স্বামী, স্ত্রী ও একটি শিশু পুত্র। স্বামী বড় গরীব, কিছু ইংরাজি লেখাপড়া

শিখিয়াছিল, নানাস্থানে চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠাইত। ক্রমে তাহার চাকরি একটি জুটিল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন্ এক সহরে। কিন্তু বেতন এত অল্প যে, সে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রকে নিজ সঙ্গে লইয়া যাইতে সাহস করিল না। প্রতিবেশীরা তাহাকে অভয় দিলেন, "তোমার চিন্তা কি বাবা? আমরা সব রয়েছি, আমরা সর্ব্বদা দেখ্‌বো শুন্‌বো, তোমার স্ত্রী-পুত্রের জন্যে কোনও চিন্তা তুমি কোরো না। যাও গিয়ে কর্ম্মে ভর্ত্তি হও, মন দিয়ে কাযকর্ম্ম করলে নিশ্চয়ই তোমার উন্নতি হবে, মাইনে বাড়বে, তখন এসে তোমার স্ত্রী-পুত্রকে সেখানে নিয়ে যেও।"

যুবক, প্রতিবেশীদের তত্ত্বাবধানে স্ত্রী ও দুই বৎসরবয়স্ক পুত্রকে রাখিয়া কর্ম্মস্থানে গমন করিল। সেখানে গিয়া কঠোর পরিশ্রমে সে আপন কার্য্য করিতে লাগিল। মনিব খুসী হইয়া মাঝে মাঝে কিছু কিছু করিয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

মাতঙ্গিনী, তখনকার দিনেও লেখাপড়া জানিত। স্বামীর সহিত নিয়মিতভাবে সে পত্র-বিনিময় করিত। স্বামী তাহাকে মাসে মাসে খরচের টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাইয়া দিত।

স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিয়া, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া [illegible] করিবার উপযোগী বেতন যখন তাহার হইল, তখন তাহার চাকরি প্রায় তিন বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

স্বামী তখন এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করিল—ছুটি মঞ্জুরও হইল। সে তখন স্ত্রীকে পত্র লিখিল, "ভগবান এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এতদিনে আমার এমন ক্ষমতা হইয়াছে

যে, বাসা ভাড়া করিয়া তোমাদের আনিয়া নিজের কাছে রাখি। এক মাসের ছুটি পাইয়াছি। অমুক দিন হইতে আমার ছুটি আরম্ভ। অমুক তারিখে বাড়ী পৌঁছিব, এক মাস বাড়ীতে থাকিয়া, বাড়ী তালা বন্ধ করিয়া, তোমাদের লইয়া এখানে চলিয়া আসিব।”

মাতঙ্গিনী ছিল, অত্যন্ত রূপসী। স্বামীর বিদেশ গমনের বছর খানেকের মধ্যেই, তাহার অধঃপতন ঘটিয়াছিল। ক্রমে প্রতিবেশীরা সকল কথা জানিতেও পারিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহার স্বামীকে এ অপ্রিয় সংবাদ প্রেরণ করে নাই।

পত্র আসিবার পর, মাতঙ্গিনী ও তাহার জার, মহা ভাবনায় পড়িয়া গেল। “তাই ত! এক মাস পরে লইয়া যাইবে, আর দেখাশুনা হইবে না।” এই জাতীয় চিন্তাই বোধ হয়।

ক্রমে তাহাদের পরামর্শ হইল, সে আসুক, রাতারাতি তাহাকে হত্যা করিয়া, লাসে পাথর বাঁধিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেই হইবে। কেহ জানিবে না শুনিবে না। পরদিন প্রচার করিয়া দিলেই হইবে যে, ভোরে উঠিয়া সে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে হতভাগ্য স্বামী বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। প্রবাস-যাপনকালে নিজেকে সকল রকম সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া অতি কষ্টে তাহার স্বল্প বেতন হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিত। আসিবার সময় এই সঞ্চিত অর্থে, স্ত্রীর জন্য একযোড়া সোণার বালা সে গড়াইয়া আনিয়াছিল—তাহা স্ত্রীকে উপহার দিল।

পথশ্রমে শ্রান্ত ছিল—একটু সকালেই নৈশ-ভোজন শেষ করিয়া পুত্রসহ সে শয্যায় আশ্রয় লইল। ছেলেটি তখন তাহার পাঁচ বৎসরের হইয়াছে। তারপর কি ঘটিল, নদীয়া জজ আদালতে সেই পাঁচ বৎসরের ছেলের মুখে শুনুন।

"একদিন একব্যক্তি আমাদের বাড়ী আসিল, মাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "তোর বাবা।" আমি বলিলাম, "আমার একটা বাবা ত রহিয়াছে।" মা বলিল, "এও তোর বাবা, সে বাবার কথা এ বাবাকে কিছু বলিস্ না।"

নূতন বাবা আমাকে কাছে লইয়া রাত্রে শয়ন করিলেন। আমায় কত চুমো খাইলেন, কত আদর করিলেন। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম, আমার মা ও পুরাতন বাবা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে, আমার নূতন বাবা যে সেদিন আসিয়াছিল, তার গলা কাটা, রক্তে বিছানা ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। বাবা আমায় ধমক দিয়া বলিল, "চুপ্ কর্ পাজি! চেঁচাবি ত তোরও গলা এমনি ক'রে কেটে দেবো।" ভয়ে আমি চক্ষু মুদিলাম এবং ঘুমাইয়া পড়িলাম।"

গ্রামের একজন ডোম এ মোকর্দ্দমায় একটা প্রধান সাক্ষী ছিল, তাহার উক্তি হইতে প্রকাশ—

খুনের পর মাতঙ্গিনী তাহার জারকে বলিতে লাগিল, "চল, এবার দু'জনে লাসটা নদীতে দিয়ে আসি।"

সে ব্যক্তি বলিল, "দাঁড়াও, একটু স্থির হয়ে নিই। রক্ত দেখে আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে। ভয় কি? একটু সবুর কর—সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

কিছুক্ষণের পর সে ব্যক্তি বলিল, "একবার চট্ করে বাইরে থেকে আসি।" বলিয়া সে বাহির হইয়া, রাত্রির অন্ধকারে কোথায় গেল, পুলিস তাহার কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।

মাতঙ্গিনী বসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। দশ মিনিট—পনেরো মিনিট—আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তখন সে বুঝিতে পারিল, তাহার পেয়ারের লোকটি—এই অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া—পলায়ন করিয়াছে।

মাতঙ্গিনী তখন, বাড়ীতে তালা বন্ধ করিয়া, সেই অন্ধকারে বাহির হইল। গ্রামের ডোমপাড়ায় গিয়া, তাহার বিশ্বস্ত একজন ডোমকে জাগাইল। তাহার নিকট আমূল সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি আমার বাবা, তুমি আমার প্রাণ বাঁচাও। এখন মাত্র দুপুর রাত, রাতারাতি লাসটা নদীতে দাও। তোমার পুরস্কার, আমার হাতের এই নূতন বালাযোড়াটা। একটা তোমায় আমি এখনি দিয়ে যাচ্ছি—আগাম। আর একটা, কায শেষ হ'য়ে গেলেই তুমি পাবে।"—বলিয়া মাতঙ্গিনী এক হাতের বালা খুলিয়া ডোমকে দিল।

সমস্ত শুনিয়া বালা লইয়া ডোম বলিল, "আচ্ছা মাঠাকরুণ, যা করবার আমি সব করছি। তামাকটা খেয়ে নিই, খেয়ে, আমার এক বন্ধু ডোমকেও ডাকি। তাকেও সঙ্গে নেওয়া

দরকার, একলা ত আমি পারবো না। অন্ত বালাটা বরঞ্চ তাকেই দেবেন, সেও ত পুরস্কারের আশা করবে। আপনি বাড়ী যান, আমি আধ ঘণ্টার ভিতরই তাকে নিয়ে, আসছি।”

মাতঙ্গিনী বাড়ী চলিয়া গেল। ডোম, তামাক শেষ করিয়া, অন্ত কোনও ডোমকে জাগাইতে গেল না,—সে গেল থানায়। দারোগাকে জাগাইয়া মাতঙ্গিনী যাহা যাহা তাহাকে বলিয়াছিল, সমস্তই দারোগাকে জানাইল, এবং বালাটিও দারোগাকে দিল।

দারোগা সেই রাত্রেই গিয়া মাতঙ্গিনীকে গ্রেপ্তার করিলেন।

অবশেষে, সেসন জজের আদালতে মাতঙ্গিনীর বিচার হইল। কে যে হত্যা করিয়াছিল,—মাতঙ্গিনীই গলা কাটিয়াছিল, অথবা তাহার জারই ও-কার্য্য করিয়াছিল,—তাহা নির্ণীত হইল না। চাক্ষুষ সাক্ষী কেবলমাত্র সেই পাঁচ বৎসরের বালক। কিন্তু আইন এই যে, যদি দুই বা তদধিক ব্যক্তি একমত হইয়া কোনও দুষ্কার্য্য করে, তবে প্রত্যেকেই সমভাবে অপরাধী (পীনাল কোড, ৩৪ ধারা)। স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যার ধারাতেই জজ মাতঙ্গিনীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া দয়া করিয়া চরম-দণ্ড (ফাঁসি) না দিয়া, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেন।

জজ আদালত হইতে মাতঙ্গিনীকে কয়েদী গাড়ীতে (prison van) যখন জেলে লইয়া যাইত, সেই সময় পথের দুই ধারে কৃষ্ণনগরের লোক সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। গাড়ী দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তাহারা অকথ্য ভাষায় মাতঙ্গিনীকে

গালাগালি দিত,—কেহ গাড়ীর কাছে যাইয়া তাহাতে থুথু ফেলিত, ছেঁড়াজুতা প্রভৃতি, এমন কি কাগজে মোড়া বিষ্ঠা পর্য্যন্ত গাড়ীতে ছুঁড়িয়া মারিত। জনসাধারণের ক্রোধ (public indignation) এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত। তারকেশ্বরের মোহান্তের বেলায়ও এইরূপ ঘটিয়াছিল। মোহান্তের চারি বৎসর জেল হয়—হুগলি জেলে সে আবদ্ধ হইয়াছিল। গুজব রটিয়াছিল, মোহান্তকে ঘানি টানাইতেছে। সহরে জেলের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের একটা দোকান (jail depot) ছিল। মোহান্তের নিষ্কাশিত সর্ষপ তৈল সে দোকানে একটাকা সেরে বিক্রয় হইয়াছিল। (তখনকার দিনে এক সের সর্ষপ তৈলের মূল্য দুই আনা দশ পয়সা মাত্র ছিল—আমিই চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চারি আনা সের সর্ষপ তৈল কিনিয়াছি)।

সান্ন্যাল-মহাশয় ছিলেন একজন সরকারী ডাক্তার—অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট্ সার্জ্জন্। (ক্রমে তিনি সিভিল সার্জ্জন্ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এখন পেন্সন ভোগ করিতেছেন)। এক সময়, পোর্ট ব্লেয়ারের মেডিক্যাল্ অফিসরস্বরূপ গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে বদলি করে। তিনি স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া পাঁচ বৎসর কাল পোর্ট ব্লেয়ারে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন—

"পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছানর অল্প দিনের মধ্যে আমি জানিতে পারি যে, মাতঙ্গিনী তথায় রহিয়াছে। একজন বাঙ্গালী অফিসর আসিয়াছেন শুনিয়া, মাতঙ্গিনী আমাদের বাসায় আসিল, আমার

স্ত্রীর সহিত আলাপ করিয়া গেল। তারপর হইতে মাঝে মাঝে সে আসিত, আমার স্ত্রীর সহিত গল্প-গুজব করিয়া চলিয়া যাইত। তখন সে বৃদ্ধা, সমস্ত চুল তার পাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, যৌবনে সে খুব সুন্দরীই ছিল।

একদিন নির্জ্জন পথে মাতঙ্গিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। অন্যান্য কথার পর বলিলাম, "মাতঙ্গিনী, তোমার মত, আমিও নদীয়া জেলার লোক, কৃষ্ণনগরে আমার বাড়ী, ইহা আমার স্ত্রীর কাছে তুমি শুনিয়া থাকিবে। সেসন আদালতে যখন তোমার মোকর্দ্দমা হয়, তখন আমি বালক, স্কুলে পড়ি। সে সময় লোকে বলাবলি করিত, খুনটা কে করিল, তুমিই করিলে, অথবা তোমার সেই লোকই করিল, তাহা কিছুই জানা গেল না। এ বিষয়ে, অন্য সকলের মত, আমার মনেও অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। সে ঘটনার পর বহু বৎসর গত হইয়াছে। এখন তুমি আমায় সে কথা বলিবে?"

সান্ন্যাল-মহাশয় আমায় বলিলেন, "এই কথা শুনিয়া মাতঙ্গিনী কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া নতমুখে রহিল। তার পর ধীরে ধীরে, মুখ পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া বলিল, "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না।"

(২) বেশ্যা খুন

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, একদিন সন্ধ্যার পর, কলিকাতার কোনও এক কু-পল্লীতে মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। এক বারবিলাসিনী খুন হইয়াছে, ইহাই সকলে বলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল। যে বাড়ীতে খুন হইয়াছে, তথায় পুলিস গিয়া লাস দেখিল, আসামীকে গ্রেপ্তার করিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, আসামী পলাইবার চেষ্টা মাত্র করে নাই।

ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া সরেজমিন তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিলেন। বাড়ীটি দ্বিতল। যে সকল রমণী দ্বিতলের বিভিন্ন ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিত, তাহারা এইরূপ এজাহার দিল—

"আজ সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে, এই ব্যক্তি (আসামীকে দেখাইয়া) সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসে। আমরা সে সময় সাজ-সজ্জা করিয়া, ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া, খরিদ্দারের অপেক্ষায় নিজ নিজ শয্যায় বসিয়া ছিলাম। আসামী প্রথমে প্রথম ঘরটির সামনে দাঁড়াইয়া, ভিতরে উপবিষ্টার পানে অল্পক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর আর একটি ঘরের সামনে দাঁড়াইল, তারপর আর একটি—বুঝিলাম খরিদ্দার জিনিষ পছন্দ করিতেছে। অবশেষে সে, আমাদের মৃতা সখীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কপাট ভেজাইয়া দিল। অতি অল্পক্ষণ পরে সেই ঘর হইতে একটা গোঁ গোঁ শব্দ আমাদের কাণে

আসিল। আমরা ভীত হইয়া বাহির হইলাম এবং সেই কামরার দিকে ছুটিলাম। দুয়ার ঠেলিতে উহা খুলিয়া গেল। দেখি,আমাদের সখী, মেঝের বিছানো তার শয্যার উপর গলাকাটা অবস্থায় পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে এবং আসামী, বিছানার পাশে মেঝের উপর দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। হাতে একখানা রক্তমাখা ক্ষুর, তাহা দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। আমরা খুন খুন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দেহ নিঃস্পন্দ হইয়া গেল। অনেক লোক ছুটিয়া আসিল—তারপর পুলিসও আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রশ্ন। এ ব্যক্তি কে? মৃতার ঘরে এ কতদিন হইতে যাতায়াত করিতেছে?

সকলের উত্তর। মৃতার ঘরে ইহাকে পূর্ব্বে কোনও দিন আসিতে আমরা দেখি নাই। এ কে তাহা জানি না, পূর্ব্বে কখনও ইহাকে দেখি নাই।

একতলায় যে রমণীগণ বাস করিত, তাহারা বলিল, সন্ধ্যার একটু পরে এ ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উপরে যাইবার সিঁড়ি কোথা? সিঁড়ি দেখাইয়া দিলে সে উপরে গেল। অল্পক্ষণ পরে উপরে ভয়ার্ত্ত চীৎকার শুনিয়া আমরা উপরে গেলাম এবং দেখিলাম—দ্বিতলের রমণীগণ যে দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ বলিল। আরও বলিল, আসামীকে পূর্ব্বে তাহারা কোনও দিন দেখে নাই।

পুলিস, লাস হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

যথাসময়ে আসামী নরহত্যার ধারায় চালান্ হইয়া বিচারার্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রেরিত হইল।

সে বাড়ীর রমণীগণ পুলিসের নিকট যাহা বলিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসেও সেইরূপ বলিল। শেষে, যে ডাক্তার সাহেব লাস পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সাক্ষীমঞ্চে দাঁড়াইলেন।

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, বর্ণনা করিলেন। গলার সেই কাটার মাপ,—লম্বায় কতখানি, কোনখানে কতটা গভীর ছিল, তাহা বলিলেন। সরকারী উকীল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বলিতে পারেন, এ কাটা suicidal (মৃতা নিজের গলা নিজে কাটিয়াছে) অথবা homicidal ? (অপর কেহ কাটিয়াছে ?)

এখন, Medical Jurisprudence গ্রন্থগুলিতে এরূপ অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর দিবার পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ নিজের গলা নিজে যদি কাটে, তবে অস্ত্রটা রহিল তার ডান-হাতে, সে উহা গলার বাঁ-দিকে বসাইয়া, টানিয়া ডান-দিকে লইয়া গিয়া থামিল। সুতরাং বাঁ-দিকের ক্ষতের গভীরতা হইবে সব চেয়ে কম। গভীরতা ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া, ডান-দিকে যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে হইবে সব চেয়ে বেশী। কিন্তু অন্য কেহ যদি তাহাকে হত্যা করিবার মানসে এইরূপ করে, তবে সে অস্ত্র

ধরিবে নিজের ডান-হাতে ; বসাইবে, যাকে খুন করিতেছে, তার গলার ডান-পাশে, সেখানে গভীরতা হইবে সব চেয়ে কম ; ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া, বাঁ-দিকে যেখানে ক্ষত শেষ হইয়াছে, সেখানে গভীরতা হইবে সব চেয়ে বেশী।—কিন্তু, সকল সময়, গভীরতার এরূপ তারতম্য পাওয়া যায় না—তখন ডাক্তার এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হন।

এ মোকর্দ্দমাতেও ডাক্তার উল্লিখিত কারণে বলিতে পারিলেন না যে, এই কাটা suicidal অথবা homicidal.

আদালত আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কিছু বলিতে চাও ?"

আসামী। আমি কিছুই বলিব না।

সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হইল। সরকারী উকীল যাহা বক্তৃতা করিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—

সেই ঘরে এই ব্যক্তি এবং হত্যা রমণী ছাড়া, কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না যে, বলিব হয়ত সেই তৃতীয় ব্যক্তিই হত্যাকর্ত্তা। স্ত্রীলোকটার, নিজের গলা নিজে কাটিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। যদি এমন হইত যে, এ ব্যক্তি অনেকদিন হইতে উহার নিকট যাতায়াত করে, দু'জনের মধ্যে প্রেম হইয়াছে, তাহা হইলে হয়ত মনে করাও যাইত যে, কোনও ঝগড়া কলহের কারণ, অভিমানে রমণী আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। সকলেই বলিতেছে, সে বাড়ীতে আসামীকে তাহারা পূর্ব্বে কোনও দিন দেখে নাই। তাহা হইলে, আসামীই রমণীকে হত্যা

করিয়াছে ইহা স্থির। কেন করিল? চুরির অভিপ্রায়ে হইতে পারে। হয়ত পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল, গলাটি কাটিয়া দিতেই যুবতী চিরতরে নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে—তখন সে অভাগিনীর টাকা-কড়ি গহনা-পত্র লইয়া বাহির হইয়া, কপাটটি ভেজাইয়া, চম্পট দিবে। কিন্তু অভাগিনী মৃত্যুযন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করাতেই আসামীর উদ্দেশ্য বিফল হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট তখন আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন। হাইকোর্টের আগামী সেসনে, তাহার বিচার হইবে। আসামী প্রেসিডেন্সি জেলে হাজতবদ্ধ রহিল।

ইতিমধ্যে দেশে যুবকের আত্মীয়-স্বজন খবর পাইয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অসম্ভব। ও যে অর্থলোভে নারী-হত্যা করিবে, ইহা একেবারে অসম্ভব। সে প্রকৃতির ছেলে ত ও নয়।" তাঁহারা, সেসনে আসামীর পক্ষালম্বন করিবার জন্ত বড় বড় উকীল কৌন্সুলি নিযুক্ত করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসের কাগজ-পত্রের নকল পড়িয়া, এবং আসামীর আত্মীয়-স্বজনের মুখে আসামীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা শুনিয়া, আসামীর উকীলেরা অদ্ভুত বিস্মিত হইলেন। জজের অনুমতি লইয়া, প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়া তাঁহারা আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আসামীকে বলিলেন, "আসল ঘটনা সমস্ত আমাদের খুলিয়া বল।"

আসামী। বলিব না।

উকীল। না বলিলে আমরা তোমার পক্ষাবলম্বন করিব কি

করিয়া ? ব্যাপার যেরূপ দেখিতেছি, ইহাতে তোমার যে ফাঁসির হুকুম হইতে পারে।

আসামী। হউক। ফাঁসি যাইব। আমি কিছুই বলিব না।

উকীলেরা সেদিন হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসামীর আত্মীয়-স্বজনের মিনতি এড়াইতে না পারিয়া, আবার তাঁহারা গিয়া আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এইরূপ দুই তিন বার সাক্ষাতে অনেক বুঝানো সুঝানোর পর, আসামী অবশেষে আসল ঘটনাটি নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিল।

"কলিকাতা হইতে দূরে, অমুক গ্রামে আমার বাস। সেখানে আমার একখানি মণিহারী দোকান আছে, উহাই আমার উপজীবিকা। দুই তিন মাস অন্তর আমি মাল খরিদ করিতে কলিকাতায় আসি। এবারও সেইরূপ আসিয়াছিলাম।

"দশ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা বলি শুনুন। আমার এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল, অল্প বয়সে সে বিধবা হইয়া যায়। তার রূপ ছিল, সেই রূপের জন্যই তাহার সর্ব্বনাশ হইল। যোল সতেরো বৎসর বয়সে, কোনও দুর্ব্বৃত্তের সহিত সে কুলত্যাগ করে। এই ঘটনায়, লজ্জায় অপমানে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, সমাজে আমাদের মাথা তুলিবার উপায় ছিল না। প্রথম প্রথম কোন আত্মীয়-বন্ধু তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিতাম, সে মরিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাহার নামও আমাদের গৃহে আর উচ্চারিত হইত না। সে যে একদিন ছিল, ইহাও আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছিলাম।